SANSKRITIK SAMASAMAY RNI Regn. No. R.N.48333/90
April 2019. Vol. XXXIII No. 3 Rs. 20.00

প্রকাশিত হয়েছে

বিনিময় : ২০০ টাকা

ঠিক ঠিকানা

২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা- ৭০০০১২

ISSN 2456-4710

Printed, Published and owned by A. Chattopadhyay and Printed at Mondal Art Press, Basirhat Astana Road and Published from Sainpala (Behind United Club), Basirhat-743411, North 24 Parganas, W.B.
Editor : Asok Chattopadhyay

9 772456 471000

মূল্য ঃ কুড়ি টাকা

ISSN : 2456-4710

বিরতিবিহীন প্রকাশনার একতিরিশ বছর

সমাজ ও সংস্কৃতির ত্রৈমাসিক

সাংস্কৃতিক সমসময়

১২৩ তম সংখ্যা

এপ্রিল ২০১৯

ISSN : 2456-4710

সাংস্কৃতিক সমসময়

সমাজ ও সংস্কৃতির ত্রৈমাসিক
বর্ষ ৩১, সংখ্যা ১২৩
এপ্রিল ২০১৯

সূচি

সম্পাদকীয়
সময়ের দাবি ২

কবিতা ৩-৮

বিপুল চক্রবর্তী ❑ দেবাশিস গোস্বামী ❑ দেবাশিস সরখেল ❑ সব্যসাচী গোস্বামী
সইদুর রহমান ❑ মানিক মাঝি ❑ হান্নান বিশ্বাস ❑ শীলা দাশ ❑ মাধবী বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্প

স্বপন মজুমদার ❑ রাজনীতি ৯
মলয়কুমার নন্দী ❑ মেঘ-রোদ্দুর ১৪

প্রবন্ধ

পঙ্কজ সরকার, তরুণ বসু, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ❑ বাংলা গদ্যের একটি না-জানা দিক (৫) ১৭
কণিষ্ক চৌধুরী ❑ ভারতীয় ফ্যাসিবাদ ও যৌথ স্মৃতি নির্মাণ (১) ২১
তরুণকুমার দে ❑ ব্রজেন্দ্রকুমারের যাত্রাপালায় নারী-বিবেক (১) ২৭
দেবাশিস চক্রবর্তী ❑ 'কথা ও কলম'— উত্তরবঙ্গের প্রথম নাট্য আন্দোলন (২) ৩৫
নির্মল নাগ ❑ নিবেদিতা : জাতীয়তা ও বৈপ্লবিক সম্পর্ক (১০) ৪২

বইপত্র

রনধীরকুমার দে ❑ পুরানো সেই বীরের কথা ৪৫

যোগাযোগ

ফ্ল্যাট নং ১এ, অবকাশ হাউজিং কো-অপ সোসাইটি,
৮৬ হরিনাথ সেন রোড, দক্ষিণপাড়া, বারাসাত, কোলকাতা - ৭০০১২৪
দূরভাষ : ৮৪২০৯২৬৬৩০, ই-মেল : sanskritiksamasamay@gmail.com

সম্পাদক ❑ অশোক চট্টোপাধ্যায়
সাঁইপালা (ইউনাইটেড ক্লাবের পেছনে), বসিরহাট - ৭৪৩৪১১, উত্তর ২৪ পরগনা

❑ সম্পাদকীয়

সময়ের দাবি

একটা বাংলা কথা চালু আছে, চোরায় না শোনে ধর্মের কাহিনি।

জাতীয়তাবাদ আর উগ্র জাতীয়তাবাদকে তো এখন একাকার করে প্রয়োগের উদ্যোগপর্ব চলছে। দেশপ্রেমের সঙ্গে প্রশ্নহীন আনুগত্যকে যোগ করে এমন এক মিশ্রণ তৈরি করা হচ্ছে যা মানুষে মানুষে বিভেদকে তীব্রতা দিচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে অপরাজনৈতিক স্বার্থের পরিপুষ্টি। কিমাকার কিম্ভুত এক সংস্কৃতিতে ছেয়ে যাচ্ছে দেশ। যুদ্ধ শান্তিকে পদদলিত করছে। মৃত্যু এবং ধ্বংস জীবনের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চাইছে। আর নির্বাচনের নামে সমস্ত বিরোধী দলকে এক অন্ধগলির মধ্যে ঠেলে দিয়ে কর্পোরেট এবং বৃহৎ পুঁজির স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হচ্ছে দেশকে। তৈরি করা হচ্ছে এক অদ্ভুত উন্মাদনার পাঠশালা, যেখানে প্রতিবেশীকে ধ্বংস ও হননযোগ্য শত্রু হিসেবে দেগে দেওয়া হচ্ছে। ফলে সেখানকার মানুষদের বিরুদ্ধে সুতীব্র ঘৃণার মত্ত পরিবেশ জন্ম নিচ্ছে সারাদেশ জুড়ে। তীব্র বেকারি, সংখ্যাহীন কৃষকের আত্মহত্যা, দলিত ও সংখ্যালঘু নিধন, সরকারের অনৃতভাষণের স্বরূপ প্রকাশ— এসবের বিরুদ্ধে দেশজোড়া ছাত্র-যুব-বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদী আন্দোলনে ভীত হয়ে কেন্দ্রের ফ্যাসিস্ত সরকার একদিকে যেমন নিপীড়নমূলক ব্যবস্থাকে অনর্গল করেছে, তেমনই অন্যদিকে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে যুদ্ধের এক আবহ সৃষ্টি করে দেশের জনমনকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের হীন রাজনৈতিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে চাইছে।

তারা দেশের মানুষের কাছে এই বার্তা দিতে চাইছে যে প্রতিবেশী দুটি দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা ক্রমাগত নিপীড়ন, নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। এর নিহিত অর্থ এদেশের সংখ্যালঘু মানুষের ওপর নিপীড়ন ও নির্যাতন কায়েম করে প্রতিশোধের রাজনীতিকে মদত দেওয়া! এভাবে এরা সারাদেশ জুড়ে এক নগ্ন সাম্প্রদায়িক মননের উগ্র প্রকাশকে অবধারিত করে তুলেছে। আর এর স্বার্থেই যে কোনও ধরনের অসত্য এবং ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশ করে জনমনে প্রতিবেশী দেশের বিরুদ্ধে ঘৃণার আগুনে ঘৃতাহুতি দিচ্ছে। সাম্প্রতিক যুদ্ধ নামক খেলার পরিণতিতে দেখা গিয়েছে ভারতের 'অবিচ্ছেদ্য অংশ' কাশ্মিরের মানুষই ভারতেরই বিভিন্ন অঞ্চলে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের নগ্ন আক্রমণের শিকার হয়েছেন।

মনে রাখা দরকার প্রতিবেশি পাকিস্তানে বর্তমানে সেখানকার মোট জনসংখ্যার ১.৮৫ শতাংশ জনসাধারণই হিন্দু। পাকিস্তানের হিন্দু কাউন্সিলের মতানুসারে সেখানে এখন ৮০ লক্ষ হিন্দু বাস করেন। এ হিসেব ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের। প্রায় কুড়িবছর আগে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে সেখানে হিন্দু বসবাসকারীর সংখ্যা ছিল ২৪,৪৩,৬১৪ জন। অন্যদিকে বাংলাদেশে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের হিসেব অনুযায়ী বসবাসকারী হিন্দুর সংখ্যা ১.৭০ কোটি যা সেখানকার মোট জনসংখ্যার ৮.৫ শতাংশ। ২০১১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ১.২৪ কোটি। ফলে হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিস্তদের প্রচারে বিভ্রান্ত হওয়ার আগে তথ্যগুলি যাচাই করে নেওয়ার দরকার। মনে রাখা দরকার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর জন্মস্থান ছিল পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডির সন্নিকট, আর হিন্দুত্ববাদীদের অন্যতম আইকন লালকৃষ্ণ আদবানির জন্মও করাচিতে। এঁরা সাতচল্লিশের তথাকথিত স্বাধীনতা এবং দেশভাগের অনিবার্য কারণে এদেশে চলে এসেছিলেন।

চোর তো আর ধর্মের কাহিনি শোনেনা। তাই দেশভাগের নির্মম অপরাজনীতির এই উত্তরসূরি ফ্যাসিস্ত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করাই আজ সময়ের দাবি।

[মার্চ ২২, ২০১৯]

বিপুল চক্রবর্তী

মুছে দেবো

এসো হাতে হাত রাখি, প্রিয়
আমাদের ছোট ছোট হাত
পৃথিবী ফিরবে, দেখে নিও
ফিরবেই পোড়া এ বরাত

মাদকতা আর কতদিন
কতদিন বন্দুক-কামান
অ্যামিবার পৃথিবীর প্রাচীন
ফুরিয়ে যায়নি তবু প্রাণ

একাকী মরেই যেতে পারি
আছি তবু জন্মে, নব সাজে
জেনে নিক ধ্বংস-কারবারি
মরণেই শেষ হই না যে

আমাদের ছোট ছোট হাত
আমাদের ছোট ছোট প্রাণ
আমাদের দিন আর রাত
আমাদের ভালোবাসা, গান

জ্ব'লে-নিভে জোনাকির মতো
রয়ে যাবে, আছে এত কাল
ছোট হাতে মুছে দেবো ক্ষত
মুছে দেবো রক্তার্দ্র সকাল

দেবাশিস গোস্বামী

নির্বাসিত কবি

অগ্রজ কবির হাত থেকে কলম কেড়ে নিয়ে
ওরা ওঁকে নিয়ে যাচ্ছিলো
ক্রুশবাহী যিশুর মতন

তুমি তখন পথের পাশ থেকে
রক্তকরবীর মতো কবিতার পাপড়ি
ছুঁড়ে দিয়েছিলে উজ্জ্বল স্পর্ধার মুঠিতে

জানা ছিল, শিগগির তোমাকেও নির্বাসনে
যেতে হবে, ঋজু শিরদাঁড়া ধনুকের
টানটান ছিলার মতো বিপদজনক
শাসকের চোখে; নতুন বছরে তাই
গরাদের ওপারে তুমিও।

ফেলে যাওয়া পথে
শব্দ-বীজ থেকে মাথা তোলে
শত শত করবীর ঝাড়
আগুনের আল্পনা ফুলের রেণুতে
বাতাসে লাল ঘূর্ণি ওড়ায় ভয়ের বেড়া;

কী করবে রাজার প্রহরী এবার?
গাছের উন্মীল দেহ ঘিরবে জালের বুনোটে?
প্রান্তরকে ঠেকাবে প্রাচীরের ঢালে?
বাঁধ দেবে সাগর সৈকতে?

ফেলে গেছো হাতের অক্ষর
তপ্ত অঙ্গারের মতো ইতস্তত ঘাসে
ভয়ের হিমবিন্দু ঝেড়ে ফেলে
দাহ্য হয়েছে তৃণভূমি
এক কণা তারার আগুনেও
রাতের আকাশ দাউ দাউ

জ্বলে উঠতে পারে।

দেবাশিস সরখেল-এর চারটি কবিতা

ভুবন

তোমার সাম্রাজ্য দেখাতে পেরে তুমি খুশি
সাম্রাজ্য দর্শনেরও মানুষজন নেই
সুন্দরের অর্চনা না হলে, সে তো শুকনো পাতা হেমন্তের খড়
কাউকে দ্যাখো না বলে কাউকে ডাকো না বলে, বর্জন করেছে তারা
সুখের অসুখে তুমি মাঝে মাঝে দর্শনার্থী চাও।
তারা সুখে-দুঃখে জীবনের জলে ও কাদায় তৃপ্ত খুব
তোমাকে তো ফিরেও দ্যাখে না
সুখের অসুখে তুমি কাঁদো, সে কান্না অমল হাসির মতো ছড়ায় বাগানে
সে বাগানে হর-গৌরী, আরাধ্য দেবতা তোমার
এ্যাতো শ্রদ্ধা, এ্যাতো প্রীতি, তবু তোমার কেউ নয় যেন।
যেন প্রকৃতি স্বর্গের, দুজন এইমাত্র ডেকেছো দোলনায়।

বাগানের ফুল এ্যাতো পরিপাটিময় যেন সমূহ প্লাস্টিক
তুমি হেসে বলো, তাহলে ভোরবেলা শিশির জমছে কীভাবে?

তোমার সন্তান যথারীতি ক্লাসে ফার্স্ট, ক্যুইজে সেরা
ক্রিকেটের ব্যাট হাতে সাক্ষাৎ ধনিবাহিনীর বড় যোদ্ধা যেন

তবু নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয় খুব, ভাবি এক্ষুণি পালিয়ে বাঁচি।
তাহলে তো অভদ্রতা হয়,
অতএব দর্শনার্থী পেয়েছো যখন
হে সুন্দরী, আরবার দেখাও, তোমার ভুবন দেখাও।

তোমার মনে

মন্দির ভূতুড়ে বাড়ি, নাম মুছে গ্যাছে
বিকৃত বাসনাজালে উইটিপি ছত্রাকার
স্প্রে চলছে প্রহরে প্রহরে
কফি কোকো বডি তেল ল্যাপটপ, রঙ দিয়ে দেওয়াল ঢেকেছো
ভাদ্রের কুকুরমণ্ডলী চলে
অতি ঘৃণ্য কীটগুলি দেওয়াল দখল নিতেই মরে যায় দেওয়ালের জাদু

এখানেও একদিন তিনি জলের গেলাস তুলেছেন
ভাবাবেশে গেয়েছেন, ভালোবেসে সখী আমার নামটি লিখো
লিখো হে তোমার মনের মন্দিরে

ফাল্গুনী ফিরছেন

জল নেই, শতদল বিকাশ ডাঙায়।
ফাল্গুনী ফিরছেন
এমন উন্নয়নধারা
কাঁটা খায় ফুলের স্তবক।
পাখিরা ছিঁড়ছে নিজ ডানা, চিত্রহার।
কামিনীফুলের দিকে
ধেয়ে আসছে হুলগুলি,
ফুলগুলিতে পরাগমিলনের চিহ্ন নেই—
ফাল্গুনী ফিরছেন, প্রফুল্ল শকুনি।
পরীক্ষার আগে প্রশ্ন গিলছে বাজার
হাজার হাজার লেখা আনন্দবাজার
উন্নয়নে ছেয়ে যায়
আনন্দরাজার দেশ।
গাণ্ডীব নেই, কুরুযুদ্ধ নেই—
প্যাকেজ ট্যুরের টিকিট শেষ
প্রভাসের তীর্থ প্রত্যাশা শেষ।
মহাপ্রস্থানে দূরে ব্ল্যাকহোলে
লাঠিধারী পুলিশ।
ফিরছেন তিনি

আহার

পেটে ডনবৈঠক করছে সেই কেলে কুচ্ছিত নেংটিটা
সেই সময়, ঠিক সেই সময়
এগিয়ে এলো বাষ্পাকুল ভাত ভর্তি হাতখানা
যেন ঈশ্বরের হাত, পাশে জনকদুহিতা মাতা সীতা
চিরদুঃখের ব্যঞ্জন বইনে
তোমার চিহ্নটি পাই না সেখানে।

তুমি কোনো প্রান্তিকতা নও
কড়াভর্তি দুধের উথলানো শরটুকুমাত্র
পোনওয়ের পাহাড় পেরিয়ে মাংসময় লেখা
হরিণের ডাক নিশিকাজল
ঢেউয়ে আছো, হিল্লোলে আছো
তোমার লেজেন্ড লাইফে কোনো প্রান্তিকতা নেই

সব্যসাচী গোস্বামী

এই সে সময়

এই সে সময়, চোখটা বাঁধা
হাতের মুঠোর দাড়িপাল্লায়
মাপছ যা তা তুমিই বলো
সমান, নাকি সামান্য কম।

এই সে সময়, হাতটা বাঁধা
যতই তুমি পিঠ চুলকোও
পিছন মোড়া, নড়ছি না তাই
যদিও হাসি পাচ্ছে বেদম।

এই যে সময়, দু'হাত দিয়ে
যতই চেপে ধরছ টুঁটি
যতই তুমি পড়াও বেড়ি
ঝন্‌ঝনিয়ে উঠবে শেকল।

এই সে সময় বন্দি খাঁচায়
বুকের ভেতর যন্ত্রণারা
বিদ্রোহে আজ উঠছে ফুঁসে
হৃদয় জুড়ে মুক্তাঞ্চল।

সইদুর রহমান

তোর জন্য এক পৃথিবী

তুই যে আকাশ ছাতার মতন নির্ভরতার আলো
তুই যে রঙিন স্বপ্নে দেখা শান্তির দিনকালও।

তুই যে আমার চড়ুইভাতি মকরডুবে স্নান
তুই যে আমার খেজুররসে শিশিরভেজা ঘ্রাণ।

তুই যে আমার জ্যোৎস্না ধোয়া জোনাকজ্বলা মাঠ
তুই যে আমার শালুকঘাটে জলছোপান পাট।

তুই যে আমার ভাদুটুসুর মরাইভরা সুখ
রাঙামাটি তোর জন্য পথ চেয়ে উৎসুক।

তুই যে আমার স্মৃতির সোহাগ চাঁপাচন্দন ব্রত
আদর নেবার দুষ্টুমিরা তোরই অনুগত।

ব্যাকুল হাওয়া তুই যে আমার বৃষ্টিঝরা দিন
তোর ছোঁয়াতেই শিউরে ওঠা, জন্মকাতর ঋণ।

তুই যে আমার শ্রাবণদিনের মেঘলা অভিমান
তোর জন্যই চোখের পাতায় কূল উছাল বান।

ঊষর ক্ষেতে তুই যে আমার ফসল উর্বরতা
তোর জন্যই বাঁচার মানে— মাটির কথকতা।

তুই যে আমার ফাগুনদিনের দুরন্ত শালবন
তুই চিরকাল নন্দিন আর আমরা যে রঞ্জন।

তুই যে আমার দস্যিপনায় জানালাদুপুর একা
তোর ইশারায় চর্যাতে পায় ঘাইহরিণীর দেখা।

তুই যে আমার ধর্মবিহীন লালন-বাউল কথা
তোর জন্য এক পৃথিবী— খুঁজব স্বাধীনতা।

তুই যে আমার ইচ্ছে ভীষণ লড়তে কবুল জান
তোর জন্যই বুভুক্ষুদের সামনে শাসক ম্লান।

তোর জন্যই আমার যুবক চিতিয়ে দেয়া বুক
তোর জন্যই যুদ্ধবাজরা বধির এবং মূক।

তুই যে আমার মনখারাপের তুমুল অবসান
তুই যে আমার দিনবদলের বব ডিলানের গান।

তুই যে আমার মাদল বোলের ছন্দে বাঁধা সুর
তোর জন্যই রাষ্ট্রনিশান— ভেঙে হবে চুরচুর।

হাজার বছর তোর জন্যই হাঁটার পরিশ্রম
তুই'ই যে আমার অবাধ্যতা, আমার অসংযম।

মানিক মাঝি

স্যালুট

অন্ধকার পেলে মুক্তির পথ এঁকে দিতো
রাতের দেওয়ালে

নিষ্ফল নিঝুম চুপ, থাকে জোনাকিরা
জীবন খায় জীবনের ফুসফুস
মধ্যরাতে কে যায়— বিড়ম্বনা! অদৃশ্য চলা
অন্তর জাগে, ছেলেটি ফেরার শুনি। এখনো
টালি-চালের উপর দিয়ে উড়ে যায় তার পদধ্বনি।

বলে দাও ওদের, এ মাটির উর্বর স্নিগ্ধতা।
আমার দেশ, সাত পুরুষের সমৃদ্ধ ভাষা।
কোথাও পাবে না শিশির জড়ানো পায়ে দূর্বা ঘাস
পাষণ্ড সরকারি পুলিশ
তোলে না যেন বেলচায় লাশ।

বিপ্লব স্যালুট দাও।

হান্নান বিশ্বাস

পৃথিবীটা কার

ভেবেছিলাম একদিন শহিদের রক্তের রঙ
হয়তো বা ধুয়ে যাবে বৃষ্টির জলে।
ভাবিনি কখনো
রক্ত মাখা রুমাল আজও
রাখতে হবে কাপড়ের ভাঁজে।
সেদিন পলকহীন পুরুষের
চোখের সম্মুখে
কিন্তু বহু নারী ছিল বিবস্ত্রা।
জীর্ণ ছিন্ন বস্ত্র আরও
ঝোপের কাঁটায়।

আজ আর শান্ত ঝোপের আড়াল নয়,
একান্ত গৃহকোণ নয়,
দূষিত রক্ত যাদের,
তাদের তীক্ষ্ণ নখ, শক্ত চোয়াল
থাবা বসানো নরম, নিষ্কলুষ আসিফাদের;
বিদীর্ণ হয়ে গেল কোমল শৈশব!
পুলিশ ছিলনা সেদিন
ছিল না দায়সারা পাথুরে ঈশ্বর!

পৃথিবীটা কার আজ!
মানুষের!

নাকি নরপশুদের!

শীলা দাশ

নিষ্ফলা শপথ

মাতার জঠর ছুঁয়ে
প্রতিজ্ঞা করেছিলে
তুমি শোধ দেবে পিতৃঋণ
তুলে নেবে দায়ভার
জন্মের মৃত্যুর জীবনের

বলেছিলে বন্ধ্যা বালুচরে
রেখে যাবে
শস্যের পরাগরেণু
বাসযোগ্য করে যাবে
বিত্তহীন জীবনের নীড়

সে শপথ কি
আজ সময়ের স্রোতে
ভেঙে পড়া ঢেউ
নির্জলা নিষ্ফলা?

মাধবী বন্দ্যোপাধ্যায়

মনে পড়ে সেই খোপ

মনে পড়ে আমার সেই খোপটি
একটা ঘরে পড়াশুনার ডিস্টার্ব তাই
পুরনো বেড়া দিয়ে নিজেই ঘরের ভিতর খোপটা বানিয়েছিলাম।
সেই যখন সব বন্ধুদের সঙ্গে তর্কে হেরে গিয়ে
খোপে ঢুকে পড়তাম নিজে সপক্ষে যুক্তি খাড়া করতে
সেই যখন প্রয়োজনীয় বায়োলজি বকস কেনার জন্য
পয়সা চেয়েছি আর বাবা বলেছ হবে না
অপমান লুকোবার জন্য খোপে ঢুকে গেছি
সেইদিন যখন হ্যারিকেনের তেল কেনার পয়সা ছিল না
অসহায় বোধ করে খোপে ঢুকেছি
বেড়ার ফাঁক দিয়ে সারারাত চাঁদ দেখেছি।
সেই দিন যখন হাজার দুঃখ নিয়ে বসে আছি চোখের জলের আকাল
কিন্তু খোপে ঢুকে নদীর জল থৈ থৈ।
খোপটা যেন দুঃখে সান্ত্বনা সুখে আনন্দ দিত।
এখনো একটা খোপ আছে
আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত।
কিন্তু সেই বেড়ার হাতে তৈরি খোপটার কথা আজও মনে পড়ে।

স্বপন মজুমদার

রাজনীতি

হঠাৎ ফটাস করে একটা শব্দ। ওপর থেকে মুখ থুবড়ে পড়ল একটা কাক। দু-একবার ডানা ঘষটে একটু নড়ে উঠে মরে গেল সেটা। তার হাঁ-করা ঠোঁট আকাশের দিকে। মুখের ভিতরটা সিঁদুরের মতো টকটকে লাল। মুহূর্তে কাকের মেলা বসে গেল মৃত কাকটাকে ঘিরে। কিছু উড়ে বেড়াচ্ছে, কিছু এসে আবার বসছে কাকটার পাশে। সঙ্গে কর্কশ কা-কা ডাকের কোরাসে তিষ্ঠনো দায় হয়ে উঠল।

পাড়ার ভিতরে গলি-রাস্তার পাশে পার্টি অফিস। একপাশে তিনটে বাইক দাঁড়িয়ে। দেওয়ালে বড় কাট আউট। বোঝা গেল কাকটা মরেছে ইলেকট্রিক তারে শক খেয়ে। তখন সেটাকে নিয়ে কী করা যায় ভেবে সবাই দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে, অর্থাৎ দাদার নির্দেশের অপেক্ষায়। সকাল দশটা। বাইরে চনমনে রোদ। পার্টি অফিসের দক্ষিণে, অর্থাৎ পিছনদিকে বেশ বড় একটা পুকুর। সেদিক থেকে হালকা বাতাস আসছে। সিলিং থেকে দুটো পাখা ঘুরলেও পুকুরের ঠাণ্ডা বাতাস টের পাওয়া যায়। তিনখানা জানালা সেদিকে। কিন্তু দাদা ঘামছেন। দাদার ভারী মুখটা অতিরিক্ত ভারী হয়ে ঝুলে আছে। একটা প্লাস্টিক চেয়ারে বসে আছেন তিনি। তাঁর পরনে সাদা পাজামা-কুর্তা। গায়ের রং কালো হলেও তাঁকে সুপুরুষ বলেই মনে হয়। তাঁর গলায় সোনার চেন, আঙুলে পাথর বসানো দুটো সোনার আংটি।

তাঁর পায়ের কাছে সাতজন বিশ্বস্ত কর্মী ভেট্রিফায়েড মেঝেতে বসে। দাদার অতি ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত একজন পাশের চৌকিতে পা গুটিয়ে বসে দরজার দিকে তাকিয়ে কাকেদের শোকসভা দেখছে।

দাদার চোখ দেখা যাচ্ছে না। এমনিতেই কুতকুতে চোখ, তার ওপর মাথাটা ঝুঁকে আছে, থুতনি বুকের কাছে লেগে। গভীরভাবে কিছু ভাবছেন দাদা।

সন্দেহ নেই, মারাত্মক একটা সংকট দানা বাঁধছে। কখন কি ঘটবে কেউ জানে না। তার মধ্যে কাকেদের হঠাৎ উৎপাত। বিরক্ত তিন নম্বর চার নম্বরকে ইশারা করল। সে উঠে স্টোররুমে ঢুকে পতাকার লাঠি খুলে নিল একটা। ডান হাতে সে লাঠি বাগিয়ে বাঁ হাতে মৃত কাকটার ঠ্যাং ধরে একটু দূরের ডাস্টবিনে ফেলে এল। কাকেরাও পাক খেতে খেতে সরে গেল সেদিকে। কিন্তু দাদা একইভাবে চুপ, গম্ভীর। চা এল বড় রাস্তার পাশের দোকান থেকে। কাগজের কাপে চা ঢেলে একটা ট্রেতে সাজিয়ে রাখল ছেলেটা। সাত নম্বর আলমারি থেকে দাদার চিনামাটির কাপ নিয়ে এল। দোকানের ছেলেটা ঐ কাপে চা ঢেলে দিয়ে ফিরে গেল। এবার সাত নম্বর একটা বিস্কুটের প্যাকেট এনে খুলে ঢেলে দিল আর একটা ট্রেতে। তিন নম্বর বলল, 'দাদা, শুধু একবার হ্যাঁ বল, দেখ, দু-তিনটেকে গলা টিপে মেরে দিচ্ছি। লাশ খুঁজে পাবে না!'

'একদম ঠিক, বেইমানের বাচ্চাগুলোকে শিক্ষা দেওয়া দরকার।' বলে চার নম্বর।

'আহ!' ধমকে ওঠেন দাদা।

আসলে দাদা শুধু বিরক্ত না, অবাকও। অসম্ভব অবাক তিনি। যা ঘটছে, ঘটতে চলেছে, তাকে

কি শুধু বেইমানি বলে? তবু এইসময় মাথা ঠাণ্ডা রাখা উচিত— ভাবছেন দাদা।

দাদা এলাকার দাপুটে কাউন্সিলর। এই ওয়ার্ডের জন্য তাঁর অবদানের কোন তুলনা হয় না। ওয়ার্ডের এক টেরে পচাপুকুর বস্তি। একটা পুকুর ঘিরে কবেকার সার সারা খুপরি ঘর। সেখানে বাচ্চা-বুড়ো মিলে এখন শ'দুয়েক লোকের বাস। ওরা ক্রমশ সংখ্যায় বাড়ছে নোংরা, অস্বাস্থ্যকর খুপরি ঘরে বেঁচে থাকে। বউ-ঝিরা এলাকার বাবুদের বাড়ি কাজ করে। পুরুষেরা কেউ ভ্যানরিকশ চালায়। কেউ যখন যেমন রোজ খাটে। আবার কেউ কিছুই করে না। বউয়ের পয়সায় মদ খেয়ে পড়ে থাকে নালার ধারে কিংবা বাবুদের বাড়ির সিঁড়িতে বা ধাপিতে। এদের কয়েকজনের একটা দল স্বাধীনতার পরপরই এসেছিল মুর্শিদাবাদ থেকে কাজের খোঁজে। তখনকার জমিদার ওদের থাকতে দেয় তার পাঁচিল ঘেরা লেঠেলখানার কয়েকটা ঘরে শ্রমের বিনিময়ে। দিনে দিনে আড়ে-বহরে সংসার বাড়লেও, বংশানুক্রমিকভাবে কালো ক্ষয়াটে রোগা মানুষগুলোর তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। যদিও এখানকার যুবক-যুবতীদের ভাষায় মুর্শিদাবাদের টান প্রায় নেই। এছাড়া পোশাক-আকাশ আর মোবাইলের ব্যবহার তাদের সংস্কৃতি অনেকটাই বদলে দিয়েছে। শহরের মূলস্রোতের মানুষগুলোর সঙ্গে ক্রমশ তাদের একটা যোগসূত্রও তৈরি হচ্ছে। ফলে একটা জেনারেশন গ্যাপ ঘনিয়ে উঠেছে। দাদা নতুন প্রজন্মের এই ছেলেগুলোকে লুফে নিলেন। তখন দাদার ভারি কষ্ট হ'ল বস্তির মানুষগুলোর জন্য। দাদা আমূল বদলে দিলেন পাঁচিল ঘেরা বস্তির পরিবেশ। প্রথমেই, পুকুরের সংস্কার করিয়ে জলধারণের ক্ষমতা বাড়ালেন, পাড় বাঁধালেন, পাকা ঘাট করে দিলেন। ঢেলে সাজালেন নিকাশিব্যবস্থা। রাস্তার পাশে ক্লাব গড়লেন। সেখানে এল.ই.ডি টিভি, ক্যারাম বোর্ড, ছেলেরা যদিও ক্লাবে তাস খেলে, দুপুরে গরমে মার্বেলের মেঝেতে গামছা পেতে ঘুমোয়। সন্ধ্যের পর ক্লাবে বসে মদ খায়। সে-সব অবশ্য ধর্তব্যের মধ্যে না। নিন্দুকেরা বলল, 'বস্তির শ'দুয়েক ভোট দাদার বাঁধা।' এ ভাবেই দাদার নজরদারিতে সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল। দাদা তাঁর সাম্রাজ্য নিয়ে হয়তো বা নিশ্চিন্তই ছিলেন। কিন্তু দাদা আজই হঠাৎ টের পেলেন কোথাও একটা ছন্দপতন ঘটে গেছে। দাদা দেখলেন, বস্তির ছেলেগুলো অসংখ্য রঙিন ত্রিকোণ ছোট ছোট পতাকায় রাস্তা ছেয়ে ফেলেছে। আরো দেখলেন, রাস্তার পাশে একটা প্যান্ডেল হয়েছে।

এক নম্বর ওদের জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী হচ্ছে রে?'

'দাদা, বজরংবলীর পুজো হবে।' বলেছিল ওদের একজন।

'ওহ, বলিসনি তো আগে? আচ্ছা, চাঁদা নিয়ে যাস।' বলেছিলেন কাউন্সিলর নিজে।

কিন্তু চাঁদা নিতে ওরা কেউ আসে নি। বরং দুই-তিন-চার নম্বরেরা যে খবর নিয়ে এসেছিল, দাদা সে-সব বিশ্বাসই করতে পারেন নি। অদ্ভুত এই, ওই ক্লাবঘরেই রাখা হয়েছে অসংখ্য অস্ত্র। তলোয়ার, রাম-দা, ত্রিশূল, লাঠি— কী নেই! এরকম না অস্ত্র আসছে গোপনে। আসছে খোলা-মেলা ভ্যানরিকশয়। কোথা থেকে আসচে, কে দিচ্ছে সে-সবের অবশ্য কোন জবাব নেই। শোনা গেল, দুপুরের পর ওরা ওই সব অস্ত্র নিয়ে মিছিল করবে। দাদা ক্রমশ সব জেনেছেন, বুঝেছেন। কত টাকা পেয়ে বস্তির ছেলেগুলো এসব করছে জেনেছেন তিনি। সব দলেই মিরজাফরেরা থাকে।

এবার এক নম্বর মুখ খোলে, 'তাহলে অস্ত্র নিয়ে মিছিল করতে দেবে ওদের?'

'তোরা একবার ইঁদুরের বাচ্চাগুলোর সঙ্গে কথা বলে দেখ, যদি কাজ হয়।' ঠান্ডা গলায় বলেন দাদা।

ওরা জনা-পাঁচেক উঠে গেল বস্তির ছেলেগুলোর সঙ্গে কথা বলতে। কাকগুলো চিৎকার করে ডেকে যাচ্ছে। একটু দূরে হলেও কানে আসছে। দাদা ভাবেন, এই খেলাটায় তাকে জিততেই হবে। মাথা ঠান্ডা রেখে ভাববার চেষ্টা করেন তিনি। ভাবেন, ছেলেগুলো নিমিত্ত মাত্র, আসল লড়াইতো অন্যত্র। ভিতরে ভিতরে ঘুণপোকারা এইভাবে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করে। এতদিন সেরকম কিছু ঘটেনি, আজ ঘটছে। ভবিষ্যতেও ঘটবে। নিজের জায়গা ধরে রাখার জন্য চাই বুদ্ধিমত্তা, সেটাই রাজনীতি। একে একে এলাকার লোকজন আসছে পার্টি অফিসে। তাদের আর্জি শুনছে একনম্বর। কারো কারো দরখাস্ত জমা নিয়ে নিচ্ছে সে। আবার কারো দরখাস্তে কাউন্সিলরের স্ট্যাম্প মেরে দাদার সই করিয়ে ফেরত দিচ্ছে। কেউ পুরসভার ট্যাক্স কমাতে চায়। কেউ বাড়ির প্ল্যান পাশ করাতে চায়। কারো ট্রেড লাইসেন্স চাই। — এসব রোজের ব্যাপার। তবে দাদা কাউকে ফেরান না। দাদার শাগরেদরা বস্তির উঠতি ছেলেগুলোর দু-চারজনকে পেয়ে গেল। তাদের দেখে তেমন কোন হেলদোল নেই ওদের। হৈ-হৈ করে সাত ফুটের বজরংবলী এসে গেছে। ম্যাটাডোর থেকে নামাচ্ছে ওরা। রাস্তার পাশে পুকুর পাড়ে কিছুটা বাঁধানো জায়গা, সেখানে গ্যাস ওভেনে রান্না শুরু হয়েছে। প্যান্ডেলে পুজোর ফল কাটছে বস্তির মেয়ে-বউরা। এইসময় প্যান্ডেলের দু-পাশের ডিজে বক্স দুম-দুম করে বেজে উঠল। সোজা বুকে গিয়ে আঘাত করে সেই শব্দ। তিন নম্বর দেখে ক্লাবঘরের দরজায় তালা দেওয়া। গোটা বস্তিটা ভেঙে পড়েছে প্যান্ডেলে। কিছু বয়স্ক লোক ইতিমধ্যেই মদ খেয়ে বেসামাল হয়ে পড়ছে-উঠছে-নাচছে। সব দেখে-শুনে ফুঁসছে। উঠতি দু-জনকে ধাক্কা মারতে মারতে ডিজের শব্দ থেকে একটু দূরে একটা বাড়ির আড়ালে নিয়ে এল ওরা। ছেলে দুটোর একজন বলে চলেছে, 'দাদা, ছেড়ে দিন না, একটু আনন্দ করছি।'

'শুয়োরের বাচ্চা, পুজো করছিস, আমাদের পারমিশন নিয়েছিস?' বলে তিন নম্বর।

'সবাই মিলে একটু আনন্দ করছি, দাদা!' তার এক কথা।

'তোদের ফুর্তি করার টাকা দরকার, বলিসনি কেন? দাদা তোদের টাকা দেয় না?' তিন নম্বরের চোখ লাল।

ঘাড় নাড়ে ছেলেটা।

চার নম্বর বলে, 'নিয়ে চল দাদার কাছে!'

তিন নম্বর হাত তুলে থামায়। তারপর ছেলেটার চুল মুঠো করে ধরে মাথাটা দেওয়ালে ঠেঁসে বলে, 'কান খুলে শুনে রাখ, এই এলাকায় কোন মিছিল-টিছিল হবে না! ঠিক আছে?'

ছেলেটি এবারও ঘাড় নাড়ে। অর্থাৎ ঠিক আছে।

ফিরে যায় ওরা পার্টি অফিসে। দাদা মোবাইলে কথা বলছেন। এক নম্বর চোখের ইশারায় জানতে চায় কি হল। তিন নম্বর হাত তুলে বুঝিয়ে দিল সব ঠিক আছে।

বাইরে চড়া রোদ। কাকেদের চিৎকার ছাপিয়ে ডিজের শব্দ পাক খাচ্ছে বাতাসে। এইসময় পাড়ার তিনজন বয়স্ক মানুষ এলেন। দাদা তাঁদের দেখেই ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'আসুন, আসুন, বসুন!'

দাদা নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'বলুন, হঠাৎ কী মনে করে?'

ওদের একজন মৃদুস্বরে বললেন, 'তোমাদের ঐ পুজো প্যান্ডেলের বক্স-এর আওয়াজ যদি একটু আস্তে করা যায়—।'

তিনি কথা শেষ না করে দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তরের অপেক্ষায়।

'চিন্তা করবেন না। সত্যি, এটা আমার এতক্ষণ ভাবা উচিত ছিল। আমি এক্ষুনি ব্যবস্থা নিচ্ছি।' দাদা একজনকে ইশারা করলেন। বেরিয়ে গেল সে।

'আর বলবেন না, এ সব করছে ঐ বস্তির ছেলেগুলো। আমরা কোনভাবে এতে ইনভলভড নই। এখন রেওয়াজ হয়েছে, গলিতে গলিতে বজরংবলীর পুজোর।' হেসে বলেন দাদা।

হাসেন ওঁরাও। বেরিয়ে যাবার আগে একজন বলে ওঠেন, 'তা বাবা, এত রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি হচ্ছে, পাইপ বসছে, কে দক্ষযজ্ঞের মতো। আমরা বিকেলে একটু হাঁটতে বের হতাম। সে-সব বন্ধ করে দিতে হয়েছে।' ভদ্রলাকের ঠোঁকে হাসি ঝুলে আছে।

বলেন দাদা, 'আর ক'টা দিন, কাকা, সব একদম ঠিক হয়ে যাবে।' হাসেন দাদা।

হাত উল্টে হেসে ফিরে যান ওঁরা। একটু পরে দাদা খেয়াল করেন ডিজের শব্দ আর তেমন শোনা যাচ্ছে না। এরপর দাদা বেরিয়ে গেলেন, সঙ্গে এক-দুই-তিন। দাদা এক নম্বরের বাইকের পিছনে। সামনে-পিছনে দুটো বাইক দুই আর তিন। শত্রুর অভাব নেই। চলা-ফেরায় তাই বাড়তি সতর্কতা, অথবা এটাই রেওয়াজ। রাস্তা কাঁপিয়ে কাউন্সিলরসাহেব যাচ্ছেন পুরসভায়। প্রশাসন জানে অস্ত্র নিয়ে মিছিল বের হতে পারে। এ নিয়ে নানান টানাপোড়েন চলছে। ভয় তাদের, কোন ধর্মে না আঘাত পড়ে। শান্তি রক্ষার জন্য পুলিশ তাদের মতো ব্যবস্থা নিচ্ছে। কিন্তু দুপুর গড়াতেই শহরের রাস্তা যেন যুদ্ধক্ষেত্র। যুদ্ধ না হলেও মারাত্মক সব অস্ত্র নিয়ে আস্ফালনে কেউ থেমে নেই। অবাক হয়ে শহরের মানুষ দেখল, এ-ও সম্ভব! আইন-কানুনের তোয়াক্কা করছে না কেউ। মিছিলে মূলত নিম্নবিত্ত পরিবারের দশ-বারো-চোদ্দ বছরের ছেলেরা বেশি। তাদের কারো হাতে তলোয়ার, চপার, ভোজালি তো অন্য কোন মিছিলে টাঙ্গি, ত্রিশূল। দিশেহারা পুলিশ-প্রশাসন। টিভিতে ঘোষণা করা হয়েছে বারবার, যারা অস্ত্র নিয়ে মিছিল করবে, তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাহলেও তাতে তেমন কিছু ফারাক পড়েনি। সবার মতো দাদাও লক্ষ্য রাখছেন পরিস্থিতির উপর। তাঁর বারণ সত্ত্বেও বস্তির ছেলেগুলো অস্ত্র নিয়ে মিছিল করে অন্য একটা বড় মিছিলে যোগ দিয়েছে। দাদা জানেন, পিছন থেকে কলকাঠি নাড়ছে কে বা কারা। তারা একেবারে আত্মগোপন করে আছে তা নয়। যদিও গোপনে বস্তির মানুষগুলোর সঙ্গে একটা আঁতাত গড়ে তুলছে। সন্ধ্যের সময় আবার সবাই পার্টি অফিসে জড়ো হয়েছে। দাদা তাঁর ওপরওয়ালাদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রেখে চলেছেন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ মেনে চলছেন। তাঁর শাগরেদরা যদিও বিশ্বাস করে, বেইমানির শাস্তি হওয়া উচিত। বলে তারা, 'শুধু একবার হ্যাঁ বলো তুমি।'

দাদা ধমক দেন ওদের। বলেন, 'তোরা রাজনীতিটা এতদিনেও শিখলি না।'

'সেজন্য দাদা তুমি আছ, আমাদের শুধু অ্যাকশন চাই।' বলে কেউ।

দাদা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেন তাকে। বলেন, 'সময়ে দেখা যাবে!'

এদিকে চাপ আসছে চারদিক থেকে। পার্টির ভিতরে রাষ্ট্র হয়ে গেছে, দাদার ওয়ার্ড থেকে অস্ত্র নিয়ে মিছিল বের হয়েছে। তীব্র সমালোচনা হচ্ছে এ-নিয়ে। নিন্দের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে পাড়ার কয়েকজন ভদ্রলোক পার্টি অফিসে এলেন দাদার সঙ্গে দেখা করতে। বললেন তাঁরা, 'শান্তিকামী ভদ্র মানুষজন থাকে এ পাড়ায়। এটাই এ পাড়ার বৈশিষ্ট্য। অথচ বস্তির বাচ্চা-কাচ্চা ছেলেগুলো মারাত্মক সব অস্ত্র নিয়ে মিছিল করল, এটা তো একরকমের অশুভ ইঙ্গিত!'

দাদা দুঃখপ্রকাশ করে বললেন, 'মাপ করবেন, আমি সত্যিই বুঝতে পারিনি আমার বারণ

সত্ত্বেও ওরা অস্ত্র নিয়ে মিছিল করার সাহস দেখাবে। আসলে, অশুভ শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। তবে ভাববেন না, ভবিষ্যতে আমি এরকম কিছু হতে দেব না।' গভীর রাত্রে দাদা তাঁর শাগরেদদের নিয়ে বস্তির চারপাশ ঘুরে দেখে এলেন। ক্লাবঘর ভিতর থেকে বন্ধ। বজরংবলীর প্যান্ডেলে বেওয়ারিশ লাশের মতো পড়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে ক'জন। মদের গন্ধে সেখানকার বাতাস ভারী হয়ে আছে। একই অবস্থা নর্দমার ধারে, রাস্তায়, ধাপিতে। কোথাও কুকুর বমি চাটছে। গন্ধে নাকে রুমাল চাপা দিতে হয়। রাস্তায় পড়ে গড়াগাড়ি খাচ্ছে নানান আকারে মদের বোতল। পার্টি অফিস থেকে কাউন্সিলরসাহেব থানার বড়বাবুকে ফোন করলেন। বড়বাবুর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা হ'ল তাঁর। বড়বাবু জানিয়েছেন সিসিটিভি দেখে সবাইকে সনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।

'ভালো কথা। আমি যা বললাম, এখন তাই করুন।' ফোন রাখেন দাদা। আরাম করে বসে একটা সিগারেট ধরান। এরপর পার্টি অফিসের আলো নেভে, দরজায় তালা পড়ে। দাদাকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে যায় আর সবাই যে যার বাড়িতে। পরদিন দাদার ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হয়ে গেল। মাথার কাছে মোবাইলটা সাইলেন্ট মোডে রাখা ছিল, সেটাতে থানার বড়বাবুর বেশ কয়েকটা মিসড কল। কিন্তু গতকাল সকালের কাকেদের চিৎকারের মতো নানান শব্দ ভেসে আসছে তাঁর কানে। একটু অপেক্ষার পর তিনি টের পান বাইরে থেকে কাতর প্রার্থনা ও কান্না ভেসে আসছে। মুচকি হাসলেন দাদা। দোতালার রেলিংঘেরা বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন তিনি। যা ভেবেছেন, তাই, গেটের বাইরে গোটা বস্তির মানুষ ভেঙে পড়েছে। দাদা গেট খুলে দেবার নির্দেশ দিলেন। বাড়ি থেকে কিছুটা ফাঁকা জায়গা। দু'পাশে ফুলের কেয়ারি, মাঝে বাঁধানো রাস্তা। গেট খুলে দিতেই বাঁধ ভাঙা জলের মতো হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল বস্তির মানুষগুলো। কাঁদছে, হা-হুতাশ করছে ওরা। দাদা ওপরের বারান্দার রেলিং ধরে ঝুঁকে দেখলেন ওদের। সকাল আটটার রোদের তির্যক আলো দাদার মুখে। হাত তুলে ওদের শান্ত হতে ইশারা করেন তিনি। বলেন, 'সকাল-সকালে তোমরা আমাকে বিরক্ত করছ কেন?'

ওরা সবাই চিৎকার করে যা বলতে চায় তার মর্মার্থ হল, গতকাল রাত্রে ওদের ছেলেদের পুলিস ধরে নিয়ে গেছে। ছেলেগুলোর হাত-পা ভেঙে দিয়েছে। ওরা বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে থানার লকআপে।

কান্নার মতো কথা বলছে ওরা একসাথে, হাত জোড় করে ওপরের দিকে তাকিয়ে। বলছে ওরা, একমাত্র দাদা-ই ওদের পরিত্রাতা। দাদা এবার চিৎকার করে বলেন, 'পুলিস পুলিসের কাজ করেছে! পুলিস হ'ল আইনের রক্ষক। অস্ত্র নিয়ে মিছিল করা আইনবিরুদ্ধ কাজ। তোমাদের ছেলেরা সেটাই করেছে। সুতরাং—।'

তখন নীচ থেকে কোরাসের মতো উঠে আসে, 'আর কখনো ওরা এরকম করবে না। আপনি দয়া করে ওদের বাঁচান!'

'ঠিক আছে। তোমরা এখন ফিরে যাও। দেখছি কী করতে পারি আমি।' দাদা হাত তুলে অভয় দেন ওদের। দাদার ওপর ওদের ভরসা আছে। একে একে ফিরে যায় ওরা। দাদা সেদিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, 'শালা গণতন্ত্রে সবার ভোট সমান!'

'গুরু, পায়ের ধুলো দাও!'

দাদার চোখদুটো তখন সূর্যের আলোয় চক-চক করছে।

মলয়কুমার নন্দী

মেঘ-রোদ্দুর

বাড়তে বাড়তে কোথায় পৌঁছে গেছে এই শহর। একসময় আকাশ দেখা যেত দু'চোখের সামনে। এখন রাস্তার দু'পাশ জুড়ে মাথা উঁচু জিরাফের মত কংক্রিটের বাড়ি। আমাদের পুরনো পাড়াটা পাল্টে গিয়েছে একেবারে। রাস্তার ধারে যে বাজার বসত সেটাও এগিয়েই চলেছে প্রতিদিন। দু'চাকা, তিনচাকা, চারচাকার জটে ত্রাহি ত্রাহি রব। দুপুরের দিকে একটু বিশ্রামময় এলাকাটা। সন্ধ্যের পর পাল্টে যায় সাজ। যেন এক সুবেশা মোহিনী নারী। তার নীলসাদা বসনে সাপ খেলা করে। আলো ঠিকরে পড়ে মোহরের মত। কে বলবে বিশ-পঁচিশ বছর আগেও এখানে শিয়াল বাস করত, বাড়ির কার্নিশের আড়ালে ভাম ঘুরে বেড়াত। কতরকম পেঁচা দেখা যেত। জারুল, শিমূল, পলাশ গাছও ছিল একসময়। পুকুরও ছিল কত। এখনও দু'চারটি পুকুর অবশিষ্ট আছে বটে, তবে সেগুলিতে আর তেমন জল নেই। আবর্জনায় চাপা পড়ে গেছে সব। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক আর শুনতে পাই না। শুনতে পাই না ব্যাঙের কেত্তন। সব যেন কেমন পাল্টে গিয়েছে।

আমাদের মত দু'চারটি একতলা বাড়ি এখনও টিকে আছে চারপাশের উঁচু দেওয়ালের আড়ালে। ছাদে উঠলেও তেমন রোদ আসেনা আর। এই ছাদে বসেই এক সময় মনে যত আকাশের কাছাকাছি চলে এসেছি। চাঁদটা ছায়ার মত পড়ে থাকত একপাশে। বাতাস উদোম হয়ে নৃত্য করত। মন চাইলে দু'চার লাইন কবিতাও লেখা যেত। নিঃসঙ্গতা কখনও কখনও মানুষকে সঙ্গ দেয়। কথা বলে। শব্দের জোগান দিয়ে যায়। এখন আর শব্দেরা কথা বলে না। কাঠঠোকরার মত অবিরত শব্দ করে চলে। হাতুড়ির শব্দ, ছেনির শব্দ, রোলারের শব্দ। বাইকের প্রাণান্তকর আর্তনাদ। শহরের ধমনী কেটে বাইপাস সার্জারির মত উড়াল পুল উঠছে অবিরত। জায়গা চাই জায়গা। পাথরের খাদান, মোরামের খাদান, নদীর চরে বেড়ে উঠছে ব্যবসা। রক্ত দিয়ে দাম মেটাতে হচ্ছে অনেক সময়। কলেজে কলেজে ছাত্র রাজনীতি বেড়েছে। হাজিরা খাতা চুরি। কে বাঁধবে কাকে? সাত শবরের মৃত্যুর খবরটা বেরিয়ে এসেছে জল-জঙ্গল-পাহাড় ডিঙিয়ে। মাওবাদীরা পোস্টার দিয়ে গেছে শহরে। খবরের কাগজের পাতা উল্টোলে হাজারো হাতছানি। বড় বাড়ি, বড় গাড়ি, উৎসবের মাতামাতি। পরিদের দাপাদাপি খোলা মঞ্চ জুড়ে। আমাদের বাড়ির কাছে একটা সুপুরি গাছ ছিল। গাছটা এখনও আছে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে মনমরা হয়ে। কী গান শোনাবে? কেই বা শুনবে? মানুষের কানে এখন বলিউডের গান বাজছে, চোখে গোলাপি রঙের নেশা। ধর্ম ধর্ম করে রাজনীতির আখড়ায় কুস্তির মহড়া চলেছে রাতদিন। কে ঠিক কেই বা ভুল? নির্ভুল গণনা চলেছে টেলিভিশনের পর্দায়। বাঁশে ঘুণ ধরেছে। মঞ্চ ভেঙে খানখান। তিন রাজ্যে কংগ্রেস জিতেছে। নতুন উদ্যোগে শোভাযাত্রা। নতুন বছর কী উপহার দিচ্ছে এবার? কী দিতে পারে? 'ম্যাচুরিটি ইজ হোয়েন ইউ রিয়েলাইজ দ্যাট নিউ ইয়ার ওন্ট চেঞ্চ ইয়োর লাইফ।' সরকারও কিছুই দিতে পারছে না। শুধুই প্রত্যাশা, শুধু প্রতিশ্রুতির গ্যাস বেলুন। চাষিদের ঋণ মকুব হচ্ছে আবার। প্রান্তিক চাষিদের কী লাভ? শরৎ চলে গেছে কবে। হেমন্তও চলে যেতে বসেছে। শীত

দাঁড়িয়ে দুয়ার ধরে। সান্দাকফুতে তুষারপাত। নাও, তৈরি হও এবার। ঘরের মধ্যে নিজেকে আর আটকে রেখো না। পিছনের দিকে আর উঁকি দিও না।

আমার গণ্ডি এতটুকু। ছোট থেকে ছোট হয়ে চলেছে প্রতিদিন। খবরের কাগজ আর টিভির মধ্যে তার সীমাবদ্ধতা। কখনও মোবাইল ফোন নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বাইরের জগৎটা কিছুক্ষণের জন্যও দেখা দিয়ে যায়। যেন এক সাদা চামড়ার ভিনদেশি মহিলা। মুখটা দেখিয়েই ভ্যানিশ। কেউ কেউ খোঁজ নেয়। কেমন আছেন? কীভাবে সময় কাটে? এক কথা। উত্তরও একটাই। আমার চাকরি জীবনের সহৃদয় বন্ধু সুজন মাইতি দীর্ঘ সংলাপ জুড়ে দেয় টেলিফোন লাইনে। নরম সুরে প্রশ্ন করে আমাকে। কী শুনতে পাচ্ছেন? আপনারা শহুরে মানুষ, সুখে স্বাচ্ছন্দে আছেন। বড়দিনে কী করছেন? খ্রিস্মাস ট্রি সাজাচ্ছেন নিশ্চয়? পেস্ট্রি-কুকিস-বিরিয়ানি কত রকমের গন্ধ মিশে থাকে এসময়। ধর্মতলা গিয়েছিলেন? সেই যে আগে আমরা যেতাম। মনের গহীন থেকে কমলালেবুর কোয়াগুলি একটি একটি করে বেরিয়ে আসতে থাকে। শুধু রস সর্বস্বই নয়, কমলা রঙেও যে এক অদ্ভুত নেশা জড়িয়ে আছে। সুজন মাইতি কথা বলে চলে মুঠোফোনের অপর প্রান্ত থেকে। গ্রামে আর প্রাণ নেই। একজন আর একজনের ভালো দেখতে পারে না। রেষারেষি লেগেই আছে। পুজো আসে আর চলে যায় বুঝতেই পারি না। কাশফুল আর আগের মত হাতছানি দেয় না। ফুলে তেমন গন্ধও পাই না। একসময় মাইলের পর মাইল হেঁটেছি অচেনা ফুলের গন্ধ অনুসরণ করে। মনে করুন, কোনও মেয়ে হেঁটে চলেছে সামনে দিয়ে। ষোড়শী, সপ্তদশী অথবা অষ্টাদশীও হতে পারে। মনে করুন কোনও স্বপ্নের সিঁড়ি থেকে কেউ ডেকে চলেছে আপনাকে। আরে না না, জিন অথবা পরিগোছের কিছু নয়। হ্যারি পটারের জাদু ঝাঁটাও নয়। এ হচ্ছে এক অদ্ভুত অনুভূতি। বলতে পারেন হারানো কোনো স্মৃতি। একটুকরো ছিন্ন বস্ত্র। পড়ে আছে ঘরের কোণে সেই কবে থেকে। মনেও তো ধুলো জমে। মঝে মাঝে মন কেমন করে। চেয়ে থাকি দূরের আকাশের দিকে। এক ফালি মেঘ ভেসে চলেছে অনির্দিষ্টের দিকে। সুজন মাইতি একটু থামে। শুনুন একটা কবিতা পড়ি। মন কেমন করলে সুজন মাইতি কবিতা পড়ে। আমাকেও শোনায় কখনও কখনও। অকপটে সেদিন বলেই ফেলল আমাকে। জানেন, একটু আধটু পান করি আমি। রয়াল স্টাগ। কিছুটা সময় একটা ঘরের মধ্যে থাকি। বেশ লাগে। নেশা নয়, নেশার মত। অনেক দূর চলে যাওয়া যায়। যেন এক অলীক পৃথিবী। কোনো পিছু টান নেই। পৃথিবীর মায়া মমতা বন্ধন অতিক্রম করে সে এক অচিন রাজ্যে প্রবেশ। সুজন মাইতি হাসল। ভাবনারা ডানা মেললে এমনই হয়। কোথা থেকে কোথায় চলে যাই। সুজন মাইতি এখন বাড়ির পুকুরে স্নান করে। কোনো অসুবিধা হয় না। অনেকগুলি বছর পিছনে চলে গিয়েছিলাম। চাকরি জীবনে ট্যাপের জলে স্নান করত সুজন। ফের পুরনো অভ্যেসে ফিরে গিয়েছে। শুনুন বলি, সুজন মাইতি ওর গ্রামীণ জীবনের কথায় ফিরে আসতে চাইছিল। আগের পুকুর আর নেই। আজানুলম্বিত চুল দেখেছেন মেয়েদের? দেখেন নি তো? দেখবেন কী করে? শহরে এখন পার্লারের ছড়াছড়ি। টলটলে স্বচ্ছ জলও আর নেই। সে ছিল আমাদের চন্দনী দিঘি। শালুকফুল ফুটে থাকত। পদ্মও দেখেছি কখনও। পটে আঁকা ছবির মত একটা অধরা ভাব ফুটে থাকত সব সময়। কবিতা কী টানে আপনাকে? ভালো লাগা কবিতা পড়ি সময়ে অসময়ে। কখনও কখনও চিৎকার করে উঠি। হাতের কাছে কাগজ কলম না থাকলে ঘরের দেওয়ালে আঁচড় কাটি রং পেন্সিল দিয়ে।

খড়িমাটি দিয়ে। এ এক ছেলেমানুষি কী বলেন? দুঃখটা চেপে বসে থাকে বুকের ভিতর। নাড়াচাড়া করলে ব্যথা লাগে। কে যেন সূচ ফোটাচ্ছে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। হাতের কাছে কালিকলম থাকলে লিখে পাঠাতাম দুঃখ কারে কয়। হলুদ পাতা দেখেছেন? হেমন্তের শেষে পাতা ঝরার শব্দ শুনেছেন? এ এক অদ্ভুত বেদনা। গাছগুলো দাঁড়িয়ে থাকে নিঃসঙ্গতা বুকে করে। বিষণ্ণতার মধ্যেও একটা সুর জেগে থাকে। শীত আসছে কাঁথা মুড়ি দিয়ে। কে কাকে মনে রেখেছে? কে কাকে মনে রাখে? একটা ভয় তাড়া করে আমাকে। দুঃস্বপ্নের মত নিঃসঙ্গতা জেগে থাকে ঘরের চৌকাঠ ধরে। কে যায়? বাতাস এলোমেলো করে দিয়ে যায় সবকিছু। নতুন পুরনো ভাঙতে ভাঙতে সময় দাঁত বের করে হাসে। রঙে কোনো বিন্যাস নেই। কে যেন কালি লেপে দিয়ে গেছে সময়ের গালে। সুজন মাইতি বলল, ভাবুন। ভাবতে থাকুন।

আমার বাড়ির সামনে পরিত্যক্ত সুপুরি গাছটায় কাক বাসা বাঁধে। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে গাছটা নিঃসঙ্গতা সঙ্গী করে। একটা জলাশয় ছিল কাছাকাছি। অনেক বছর হল ভরাট হয়ে মাঠ হয়ে গেছে জায়গাটা। আমি চেয়ে থাকি হারিয়ে যাওয়া বছরগুলোর দিকে। প্রতিবছরই বর্ষবরণ হয় উৎসবের সাজে। আলোর আড়ালে অন্ধকার পড়ে থাকে। ছেলেটা বাটার লাগাচ্ছে আমার রুটিতে। কত বয়স হবে? আট থেকে দশ। শেষ ডিসেম্বরের এই শীতেও ওর গায়ে একটা অতি সাধারণ সুতির গেঞ্জি। আমি চেয়ে থাকি ওর দিকে। কী নিপুণ দক্ষতায় ডিমের খোলা ছাড়াচ্ছে। ওর চোখে কী কোনো স্বপ্ন আঁকা আছে? জিজ্ঞেস করার সাহস হয় না আমার। কে যেন ভিতর থেকে বলল, লজ্জা করছে না তোমার? এতটুকু একটা ছেলের কাছ থেকে পরিষেবা নিতে? কী করব? এই শহরের অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যেতে যেতে কাকে যেন দেখতে পেলাম। এই ছেলেটিই হয়ত একদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। অথবা, নিঃশব্দে ঝরে পড়ে যাবে হেমন্তের হলুদ পাতার মত। দু'বিন্দু শিশির হয়ত কেউ রেখে যাবে ওর জন্য নিতান্তই গোপনে। দূরে দাঁড়ানো সুপুরি গাছটা মাথা ঘুরিয়ে আমাকে দেখে। দুঃখ খুঁজে চলেছ এই অবাক পৃথিবীতে? দুঃখ খুঁজতে হয় না। খুঁজতে নেই। আপনি ধেয়ে আসে তারা উল্কাপিণ্ডের মত। এক এক করে নিভিয়ে দেয় সুখের বাতি। সুজন মাইতি কী এরকমই দুঃখের কথা বলতে চেয়েছিল? সুপুরি গাছটা মাথা উঁচু করে হাসছে। কংক্রিটের জঙ্গলে এক অবাক প্রহরী যেন। যেন একটা বার্তা। হাজারো অস্থিরতা এবং দূষণের মধ্যেও আমরা আছি। যতটুকু প্রতিরোধ করা যায় করে চলেছি। দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করে চলেছে। এক চিলতে সুখ খুঁজে চলেছি আমি নিজের মধ্যে। সুখ কী সত্যি আছে? এক ঝলক রোদ্দুর এসে পড়েছে গাছটার ওপর। দেখার কেউ নেই। দু'চারটি পাখি পড়ন্ত বেলায় বসে আছে আগামীর অপেক্ষায়। কেউ ছবি তুলছে বুভুক্ষু মানুষের জীবজন্তুর। এই শহরের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে রোদ্দুর। রাতজাগা মানুষের মিছিল চলেছে সার দিয়ে। জাগো, জাগতে রহো। এক পায়ে খাড়া সুপুরি গাছটা মাথা উঁচু করে আকাশের দিকে তাকিয়ে। নিশ্চয়ই দিন বদল হবে। না হলে যে বেঁচে থাকাই বৃথা। অদল বদল হবে সবকিছু। ভাবনাটা ডুবতে থাকে গভীরে। গভীরে, আরও গভীরে।

❑ প্রবন্ধ

পঙ্কজ সরকার, তরুণ বসু, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

বাঙলা গদ্যের একটি না-জানা দিক : কৃষি-সাহিত্য (৫)

এই ধারাবাহিক প্রবন্ধটির চতুর্থ (৪) কিস্তি প্রকাশিত হয়েছিল 'সাংস্কৃতিক সমসময়'-এর জানুয়ারি ২০১৮ সংখ্যায়। এটি লেখাটির শেষ কিস্তি।

নিজেদের ভাষাজ্ঞানের ব্যাপারে কৃষি-বিষয়ক পত্রিকার অনেক লেখকই খুব সঙ্কুচিত ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনী-র অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনে কথাসাহিত্য, কবিতা ইত্যাদির পাশাপাশি ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান নিয়েও আলাদা বৈঠক বসেছিল। সেখানে ঈশ্বরচন্দ্র গুহ, এফ.আর.এইচ.এস. (ফেলো অব দ রয়্যাল হর্টিকালচারাল সোসাইটি) তাঁর ভাষণে গোড়াতেই বলে দেন : 'আমার ভাষা-সম্পদ নাই— বিশেষত এখনও কৃষি সাহিত্যের ভাষা সর্ব্বাংশে গড়িয়া উঠে নাই। এরূপ ক্ষেত্রে, বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রবন্ধে, আপনারা ভাষা নৈপুণ্যের প্রত্যাশা করিবেন না।'

ঈশ্বরচন্দ্র গুহ ছিলেন একেবারেই স্বশিক্ষিত। অন্য বিষয়ে কলেজে লেখাপড়া করে থাকলেও, কোনো কৃষি কলেজে তিনি পড়েন নি। তবু প্রায় পঞ্চাশ বছর নিজেই একটি নার্সারি চালিয়েছিলেন। আর সেই সুবাদে কৃষি বিষয়ে কিছু বলারও চেষ্টা করেছিলেন। নিচে তার নির্বাচিত অংশ দেওয়া হলো।

সাহিত্য সম্মিলনীতে কৃষিকথা

বাঙ্গালায় বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষি, ব্যবহার— উপায় নির্দ্দেশ ও আলোচনা

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সাহিত্যসেবী বন্ধুবর্গ—

... ... সম্মিলনীর উদ্যোক্তাগণ, তাহাদের নির্ধারিত (১) ''বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান অভাব ও তন্নিবারণে উপায়" (২) ''বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষি-রসায়ন ব্যবহারের উপায়", (৩) ''বর্ত্তমান দর্শন ও বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহার প্রভাব" এবং (৪) ''পাল রাজগণের সময়ে বাঙ্গালার ইতিহাসের উত্তরণ"— এই চারটি বিষয়ের কোন একটী বিষয়ে আমাদের একটী প্রবন্ধ লিখিতে আদেশ করিয়াছেন . . .

. . . . . .

আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কোন মৌলিকতা নাই; তথাপি, আমার নার্শেরী উদ্যানে এবং কৃষিক্ষেত্রে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল, হাতে-জোগাড় বৈজ্ঞানিক কৃষি-চর্চ্চায় এবং বিভিন্ন দেশের নানা প্রকার উদ্ভিদের পরিচর্য্যায় যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি, বর্তমান প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে আমি সেই শিক্ষা ও

যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতার কথাই শুনাইব। আমার ভাষা-সম্পদ নাই— বিশেষতঃ এখনও কৃষি সাহিত্যের ভাষা সর্ব্বাংশে গড়িয়া উঠে নাই। এরূপ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রবন্ধে, আপনারা ভাষা নৈপুণ্যের প্রত্যাশা করিবেন না। . . .

আমি কখনও কৃষি কলেজে অধ্যয়ন করি নাই। বস্তুতঃ আমি লোক-প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি রসায়নের ছাত্রও নহি। প্রকৃতির বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আমি একজন অধম (?) শিক্ষার্থী শিশু। প্রকৃতির পাঠশালায় আমি যৎসামান্য কার্য্যকরী কৃষিশিক্ষা লাভ করিয়াছি এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-সম্পর্কে, কাহারও কাহারও জীবনব্যাপী-সাধনার কথা বা কৃষি-সাহিত্যের যৎকিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করিয়াছি মাত্র। ইহাই আমার কৃষি-বিদ্যা। সুতরাং আপনারা আমার নিকট কোনরূপ গবেষণামূলক প্রবন্ধও প্রত্যাশা করিতে পারেন না।

বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থা

বর্ত্তমান অবস্থা ঘটিবার প্রকৃত কারণ কি? দেশব্যাপী অভাবের প্রকৃত তত্ত্ব চিন্তা করিলে পরিলক্ষিত হইবে যে, কৃষি-বৃত্তির বিড়ম্বনাই ইহার মুখ্য কারণ। সকল দেশেরই ধনাগমের উপায়— কৃষি, শিক্ষা ও বাণিজ্য। এর মধ্যে কৃষিই সকলের মূল ভিত্তি। কৃষিতে কৃষিতে, অশনবসনোপযোগী যাবতীয় সামগ্রী এবং শিল্পের অধিকাংশ উপকরণ বা কাঁচামাল উৎপন্ন হয়। এই সকল কৃষিজাত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় এবং শিল্পোচিত ব্যবহারে শ্রমশিল্প, তথা ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিস্তার ঘটে। কৃষিতে বাণিজ্যের এবং বাণিজ্যই অর্থের মূল। অর্থ ইহলৌকিক সুখ সম্পদের এবং যাবতীয় উত্থানের হেতু। সুতরাং সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে একমাত্র কৃষিই সর্ব্ববিধ উন্নতি ও সকল প্রকার সুখ সম্পদের মূলে অবস্থিত। কৃষিই সমাজের মেরুদণ্ড, কৃষিই সমাজের ভিত্তি ও মানবসমাজের মুখ্য বন্ধনী। ফলতঃ কৃষি লইয়াই সমাজ, কৃষিকাজের উন্নতিতেই সমাজের সৃষ্টি ও স্থিতির এবং কৃষির ক্রমোন্নতিতেই সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি। . . .

কৃষির আবশ্যকতা

. . . . . যে কৃষি আমাদের অশনবসন যোগায়, যে কৃষি আমাদের শ্রমশিল্প বা পণ্য সম্ভারের জন্মদাতা, সেই কৃষিবৃত্তিতে আমাদের বিজাতীয় ঘৃণার ফলেই যে দেশে অন্ন সমস্যা ভীষণ ভাব ধারণ করিতেছে, তাহা স্বীকার্য্য। এই অন্ন সমস্যা সমাধানের প্রধান উপায় কৃষি। সুতরাং এদেশে কৃষির আবশ্যকতা রহিয়াছে যথেষ্ট। কৃষিকার্য্যে আত্ম নিক্ষেপ করিতে পারিলে, আমাদের কর্মজীবন স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হইয়া উঠিবে . . .। চাষার নেশা লইয়া চাষবাসে প্রবৃত্ত হইতে পারিলে, আমাদের নূতন কর্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে পারিব এবং তাহাতে চাকুরী সমস্যাও অনেকাংশে নিরাকৃত হইয়া যাইবে। শ্রমাধিক্যে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ক্ষেত্রজাত শস্যাদির প্রসার, পরিমাণ ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি ভিন্ন বাঙ্গালীর আর গত্যন্তর নাই।

কৃষির সহিত কৃষি-রসায়নের সম্বন্ধ

কৃষির সহিত কৃষি-রসায়নের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। ফলে কৃষি শিখিতে হইলে কৃষি-রসায়ন সম্বন্ধেও মোটামুটিভাবে সকল তথ্যই জানিতে হয়। আত্মরক্ষা এবং এদেশের অশিক্ষিত অনশনক্লিষ্ট

ও অর্দ্ধনগ্ন কৃষককুলের রক্ষা করিতে হইলে, ক্ষেত্রজাত শস্যের উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে চাহিলে, কৃষকদিগকে কৃষি রসায়ন শিক্ষা দিতে হইবে। শিক্ষিত ভদ্র সন্তানেরাও হাতে-জোগাড় চাষবাষ আরম্ভ না করিলে— আদর্শস্থলবর্ত্তী হইয়া, কৃষককে সকল বিষয়ে, বিশেষতঃ কৃষি রসায়ন সম্বন্ধে, শিক্ষা দিতে না পারিলে, পৃথিবী ক্রমাগতই শস্যহরণ করিয়া বাঙ্গালীর দুঃখ-দুর্গতির মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া তুলিবেন। যে কৃষির উপরই আমাদের জীবন-মরণ সমস্যা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, সেই কৃষির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি, কৃষি রসায়ন ব্যবহার সাপেক্ষ। সুতরাং, কৃষি-রসায়ন শিক্ষা না করিয়া, কৃষিকার্যে হস্তক্ষেপ করা বিড়ম্বনা মাত্র। কৃষি-রসায়নকে কৃষিকার্যে সাফল্যলাভের প্রথম ও প্রধান অবলম্বন বলা যায়।

কৃষিসম্পদ, বৈশাখ ১৩২২ (৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃ. ১৫)

(৬)

সর্বভারতীয় বা সর্ববঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন ছাড়াও একটা সময়ে জেলাভিত্তিক সাহিত্য সম্মেলনও হতো। ১৯২২ সালে মেদিনীপুরে জেলা সাহিত্য সম্মেলনের আসর বসে। সভাপতি ছিলেন বঙ্গবাসী কলেজের তখনকার অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু। তাঁর নামের পাশে উপাধি দেওয়া আছে : এম.এ., তারপরে এফ.আর, জি.এস (ফেলো অব দ রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি)। তাঁর লিখিত অভিভাষণে অধ্যক্ষ বসু কৃষিকথা সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেন। বিষয়টি কৌতূহল জাগানোর মতো। কারণ এতে সমবায়-সমিতি গড়ার কথা বলা হয়েছে। *কৃষিসম্পদ* পত্রিকায় তার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা হয়। নিচে সেটি দেওয়া হলো।

কৃষিকথা

... লোকের মুখে শুনি ও খবরের কাগজে পড়ি, কৃষিতে বিজ্ঞানের যোজনা করিলে, বড় বড় লাঙ্গল ও বাষ্পীয় যন্ত্র সাহায্যে ভূমি-কর্ষণ করিলে রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত সার প্রয়োগ করিলে, ফসল ও গো-মহিষের নতুন জাতি-সৃষ্টি করিলে ছোট ছোট জোত ভাঙ্গিয়া বড় বড় জোত প্রস্তুত করিলে, অনতিবিলম্বে কৃষি ও কৃষকের দুঃখ ঘুচিবে, দেশ আবার ধনধান্যপুষ্পভরা হইবে। কিন্তু এই যুক্তি আমার কাছে মূষিকের যুক্তি বলিয়া বোধ হয়, আল্লানাসকারের স্বপ্ন বলিয়া প্রতীতি হয়। উক্ত পরামর্শ ঠিক স্বীকার করিয়া লইলেও (আমি ঠিক স্বীকার করি না) পরামর্শ অনুসারে কাজ করে কে? বিড়ালের কণ্ঠে ঘণ্টা বাঁধে কে? আমরা গরীব, আমাদের অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণ, আমাদের কি সামর্থ্য যে ঐ সকল উপায় কাজে লাগাইতে পারি।

তাই বলি, এ সকল আকাশ-কুসুমের কথা ত্যাগ করিয়া, একটা প্রত্যক্ষ উদাহরণের কথা শুনুন। এক দেশের কথা আমি জানি, যাহা আমাদের দেশের ন্যায় কৃষিপ্রধান এবং সে-দেশ আমাদের দেশের ন্যায় ছোট ছোট জোতে বিভক্ত। ৫০/৬০ বৎসর পূর্বে, এই দেশের কৃষি ও কৃষকের অবস্থা অতি হীন ছিল। কিন্তু এখন সেই কৃষি ও কৃষকের অবস্থা এত উন্নত হইয়াছে যে, পৃথিবীর দৃষ্টি সেইদিকে পড়িয়াছে। কি উপায়ে তাহাদের এত উন্নতি হইল? যে মন্ত্র এই অল্প সময় মধ্যে তথায় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, তাহা এক উর্বর মস্তিষ্কের আবিষ্কার। সেই মস্তিষ্কবান

পুরুষ আপন গ্রামের অধিবাসীগণকে একত্র ডাকিয়া বুঝাইয়া দেন যে তাহারা গরীব, তাহাদের অনেকের এমন অবস্থা যে বীজ-ক্রয়ের অবস্থা পর্য্যন্ত নাই, ভূষি কর্ষণের উপযোগী যন্ত্র নাই, ফসল লালন-পালনের বিশিষ্ট জ্ঞানও নাই। ফসল পাকিলে অর্থাভাবে সময়ে গৃহজাত হয় না; ফসলের জন্মদাতা ও ভোক্তা উভয়ের মাঝখানে পঙ্গপালের দল জুটিয়া জমির উপস্বত্বের অধিকাংশ আত্মসাৎ করে, জন্মদাতার অদৃষ্টে এক চতুর্থাংশও মিলে না, এবং ভোক্তাকেও চারিগুণ দামে তাহা কিনিতে হয়,— ইহাই তাহাদের সকল অনর্থের মূল। ইহা নিবারণার্থে তিনি স্বগ্রামে সকলে মিলিয়া মিলিয়া এক ''সহযোগ সমিতি ও ভাণ্ডার'' স্থাপন করে। প্রত্যেক গ্রামবাসী আপন-আপনি সামর্থ্য অনুসারে কিছু কিছু অর্থসংগ্রহ করিয়া মূলধনের বাঞ্ছা করেন। একা একা যে সকল কাজ করা অসম্ভব ছিল, তাহা সহজসাধ্য হইল। কাহারও ... ... লোক বা অর্থাভাবে ... ...? রহিল না, বীজাভাব ঘুচিল, জল ও মারণযোগের কষ্ট রহিল না, ফসল সময়মত কাটা হইতে লাগিল, ফসলের জন্মদাতা ও ভোক্তা উভয়ের একত্র সমাবেশও... ... হইল। মধ্যবর্তী পঙ্গপাল দলের কোথায় অন্তর্ধান হইল, উপস্বত্বের ষোল আনা কৃষক পাইল, ভোক্তাগণ অল্পমূল্যে গ্রাসাচ্ছাদনের দ্রব্য সামগ্রী পাইতে লাগিল, দুই দিনে তাহাদের শ্রী ফিরিয়া গেল। এই সহযোগে— মন্ত্রের ফল প্রত্যক্ষ করিয়া, সমগ্র দেশ এই মন্ত্র গ্রহণ করিল,সহযোগ-সমিতি ও সহযোগ-ভাণ্ডারে দেশ ছাইয়া গেল। ইহারই ফলে বহু কৃষি-শিল্পের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল, সেইসকল স্কুলে কৃষকের বংশধরগণ অবসরমত, দিনে হউক, রাত্রে হউক, শীতঋতুতে হউক, গ্রীষ্মে হউক, নিজের কাজ সারিয়া, আপন-আপন বৃত্তির ''কেন'' (why) শিখিয়া আসে ও আপন আপন বৃত্তির উন্নতিকল্পে তাহা নিযুক্ত করে। কোন বৃত্তির ''কেন'' জানাই সেই বৃত্তির উন্নতির মূল।

কৃষিসম্পদ, বৈশাখ ১৩২৯ (১৩শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা)

জানুয়ারি ২০১৯-এ প্রকাশিত হয়েছে

অশোক চট্টোপাধ্যায়-এর

সরোজ দত্ত সমর সেন এ ব্রতযাত্রায়

নতুন পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত সংস্করণ

বিনিময় - ২০০ টাকা

ঠিক ঠিকানা

২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১২

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা

সম্প্রীতি মনন ❑ গণসংস্কৃতি ❑ অনীক ❑ বিকল্পচিন্তা ❑ উবুদশ ❑ নবান্ন ❑ এবং জলার্ক ❑ কালিমাটি ❑ আননায়ুধ ❑দিনান্তের অন্বেষণ ❑ তরঙ্গপ্রবাহ ❑ পর্বান্তর ❑ উল্টো দূরবীণ ❑ বনানী ❑ শিস ❑ এবং অন্যকথা ❑ রূপান্তর ❑ কবিতা সীমান্ত ❑ নয়দরজা ❑ বাসভূমি ❑ ভাবনা থিয়েটার ❑ মফস্বলী ❑ সংবর্তক ❑ এককমাত্রা ❑ ইছামতী বিদ্যাধরী ❑ তবুও দৃষ্টান্ত

কণিষ্ক চৌধুরী

ভারতীয় ফ্যাসিবাদ ও যৌথ স্মৃতি নির্মাণ (১)

১

ফ্যাসিবাদ পদ্ধতি না প্রণালী এই বিতর্কে প্রবেশ না করেও এটুকু বলা যায় যে, ফ্যাসিবাদ হলো ইতিহাসের নির্দিষ্ট কালপর্বে শোষণমূলক শাসনব্যবস্থার একটি রূপ। এই রূপটি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় শতকে ইউরোপীয় সমাজে আবির্ভূত হলেও তা অন্যান্য ধনতান্ত্রিক ও অ-ধনতান্ত্রিক দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। ফ্যাসিবাদ সংক্রান্ত আলোচনায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলিকেই সাধারণত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। সাংস্কৃতিক, মতাদর্শগত ও মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলি অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত বা অবহেলিত হতেই দেখা যায়। ভারতে ফ্যাসিবাদের উত্থানের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সেই সম্ভাবনাকে বোঝার প্রয়োজনেই সাংস্কৃতিক, মতাদর্শ ও মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলির অনুসন্ধানই বর্তমান আলোচনার মূল লক্ষ্য।

২

উদারনৈতিক ব্যবস্থায় আধিপত্য (hegemony) স্থাপনই থাকে শাসক শ্রেণীর লক্ষ্য। প্রাধান্য (domination) বা দমন-পীড়ন চলে ন্যূনতম মাত্রায়। কিন্তু ফ্যাসিবাদে প্রাধান্যই হয় মুখ্য এবং আধিপত্যর ভূমিকা হয় গৌণ। ফ্যাসিবাদে আধিপত্য নানা স্তরে থাকে। বিকাশের পর্বে ফ্যাসিবাদে আধিপত্য হয়ে পড়ে decadent বা ক্ষয়িষ্ণু এবং ফ্যাসিবাদের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার কালে তা হয়ে পড়ে minimal বা ন্যূনতম। কিন্তু একেবারে গোড়ার দিকে ফ্যাসিবাদকেও আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চালাতে হয়। কারণ এছাড়া তাদের পক্ষে লক্ষ্যপূরণ অসম্ভব। ফ্যাসিবাদের লক্ষ্য হলো একটি এক শৈলজ, সমগোত্রীয়, সমমাত্রিক, এক বগ্গা প্রশ্নহীন মন তৈরি করা। এই নির্মাণ প্রকল্পে ভারতীয় ফ্যাসিস্টদের হাতিয়ার হলো হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শ। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে বি.জে.পি. সভাপতি মুরলি মনোহর যোশি সুনির্দিষ্টভাবে এই মতাদর্শগত সংগ্রামের সূচনার কথা উল্লেখ করেছেন: "A battle of ideology has started. The question is what constitutes the identity of the nation's mainstream; can the country remain united without Hindutva?" (উদ্ধৃত। Copland, Ian. 2008 : 253. "Crucibles of Hindutva? V.D. Sararkar, the Hindu Mahasabha, and the Indian Princely States" in MeGuire and Copland. 2008)। হিন্দুত্ববাদীরা এমন একটি মানসিকতার জন্ম দিতে চায় যা রাষ্ট্রকে নিঃশর্ত আনুগত্য দেবে এবং আবেগকে সংহত করবে রাষ্ট্রনেতা ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য। এই লক্ষ্য পূরণে ফ্যাসিবাদী সংগঠনগুলির সবথেকে কার্যকরী রাজনৈতিক মতবাদ হয়ে ওঠে জাতীয়তাবাদ। ফ্যাসিবাদীরা জনগণের জাতীয়তাবাদী চেতনার কাছে আবেদন রাখে। ইউরোপের ইতিহাস এটাই সাক্ষ্য দেয়।

ভারতের ফ্যাসিবাদীদের ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হয়নি। কারণ জাতীয়তাবাদের মধ্যে এমন কতগুলি উপাদান রয়েছে যেগুলি চমৎকারভাবে ফ্যাসিবাদী চিন্তাচেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। জাতীয়তাবাদ একটা ছাঁচের মতো, যেখানে ব্যক্তিসমূহকে একটি নির্দিষ্টরূপে ঢেলে সাজিয়ে নেওয়ার

চেষ্টা হয়। জাতীয়তাবাদ বহুত্বকে, বৈচিত্র্যকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। এর মধ্যে দিয়ে এমন একট আবেগ প্রবাহ তৈরি করা হয়, যাতে ব্যক্তি তার যুক্তি, বুদ্ধি, বিবেক, মানবতাকে হারিয়ে ফেলে, আর একরকম বাধ্য হয় জাতীয়তাবাদী আবেগের স্রোতে ভেসে পড়তে, নিজের স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দিয়ে 'জাতি'র সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে, দ্রবীভূত করতে। স্বাধীন সত্তার এই বিসর্জনে ব্যক্তি দুঃখিত হয় না বা কষ্ট পায়না। বরং তার মধ্যে গোষ্ঠী থেকে আলাদা হবার ভয় কাজ করে। একেই এরিখ ফ্রম 'স্বাধীনতার ভয়' বা fear of freedom বলেছেন। (দ্রষ্টব্য Fromm. 2012. The Fear of Freedom. London : Routledge Classics)।

জাতীয়তাবাদের আর একটি ভয়ানক দিক হলো ছদ্ম যৌথচেতনা। এখানে আত্মপরিচয় বা self identity-টি তৈরি হয় সম্পূর্ণ কাল্পনিক একটি গোষ্ঠী গঠনের মধ্যে দিয়ে। ব্যক্তি গর্ব অনুভব করে 'আমরা' বা গোষ্ঠী (বা সম্প্রদায়)র সদস্য হিসেবে। ফলে মনোভাবটি হয় অসমালোচনামূলক। আমার সম্প্রদায় বা জাতি (nation)র সবকিছু ভালো, সব কিছুই গৌরবময় এবং অবশ্যই ত্রুটিহীন। এখানেই থামা হয় না। এর পরেই আসে জাতি-দাম্ভিকতা, অন্য জাতির উপর প্রাধান্য স্থাপন এবং (এমনকি) অন্য জাতি/গোষ্ঠীর ক্ষতি করার প্রবণতাও। 'ভারত কলঙ্ক' নামক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এটাই করতে চেয়েছেন।'

> হিন্দু জাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাদের মঙ্গলমাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয়, আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতি পীড়ন করিতে হয়, করিব। ... পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল সাধিত হয়, তাহাও করিব। (ব.র.স। ১৯৭৩ : ১ : ৩০১)।

ইতালির বেনিটো মুসোলিনি (১৮৮৩-১৯৪৫) এবং জার্মানির অ্যাডলফ্ হিটলার (১৮৮৯-১৯৪৫) প্রচার করেছিলেন জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা। ভারতে এই জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা ধ্বনিত হয়েছিলো রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯) থেকে শুরু করে বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)র কণ্ঠে। বিংশ শতাব্দীতে এই ভাবধারাটির শক্তিশালী প্রচারক ছিলেন সাভারকর (১৮৮৩-১৯৬৬) ও সদাশিব গোলওয়ালকর (১৯০৬-১৯৭৩) (দ্রষ্টব্য : চৌধুরী। ২০১৮)।

৩

জাতীয়তাবাদের মধ্যে এই আত্মপরিচয় গঠন যেমন সম্ভব হয়, তেমনি 'অপর' নির্মাণের প্রচেষ্টাও থাকে। হিটলারের জার্মানিতে 'আত্ম-অপর' নির্মাণ হয়েছিলো 'আর্য-ইহুদি' বিরোধের মধ্যে দিয়ে। ভারতে হিন্দুত্ববাদীরা এই কম্মটি করেছেন 'হিন্দু-মুসলিম' বিভেদ সূত্রায়নের মধ্য দিয়ে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ইতিহাসবিদ ও পণ্ডিতদের সূত্রায়িত 'হিন্দু' ও 'মুসলিম' জাতি (nation)র ধারণা প্রায় অবিকৃতভাবেই হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা গ্রহণ করে। হিন্দুত্ববাদীদের দাবি হিন্দুরা একটি জাতি (nation) যা প্রাচীন থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত অস্তিত্বশীল। এই দাবির সঙ্গে সংযুক্ত কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক লক্ষণীয়—

প্রথমত, জাতি ও জাতীয়তাবাদের ধারণা সম্পূর্ণরূপেই আধুনিক কালের বিষয়। প্রাচীন যুগে এর কোনো অস্তিত্বই ছিলো না।

দ্বিতীয়ত, হিন্দুত্ববাদীরা 'হিন্দু জাতি' ও 'হিন্দু ধর্ম'-কে সদৃশ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করে। লক্ষ্য করার বিষয় হলো ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে ধর্ম হিসেবে 'হিন্দু' শব্দটির কোনো তাৎপর্যই ছিলো না। 'হিন্দু ধর্ম' ধর্ম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীতেই। (দ্রষ্টব্য : চৌধুরী। ২০১৮)।

তৃতীয়ত, হিন্দুত্ববাদীদের লক্ষ্য হলো হিন্দু ধর্মকে একটি একমাত্রিক, সমগোত্রীয় ও সম বিশ্বাসে বিশ্বাসী মানুষের সমষ্টি অর্থাৎ সকল অ-ইসলামপন্থীদের একটি ছাঁচে ঢেলে একটি 'এক শৈলজ' রূপ দেওয়ার চেষ্টা। একইভাবে 'মুসলিম'দের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

চতুর্থত, 'হিন্দু ধর্ম' ও 'জাতি' নির্মাণের বিপরীতে জন্ম দেওয়ার চেষ্টা চলেছে একটি 'অপর'-এর অস্তিত্ব। হিন্দুত্ববাদীদের এই 'অপর' হলো সকল ইসলামপন্থী মানব সম্প্রদায় অর্থাৎ মুসলিমগণ। এঁরাও 'হিন্দু' ধর্মাবলম্বী মানুষের মতোই বহু বিচিত্র সমাজ বন্ধনে ও বিশ্বাসের মধ্যে বিন্যস্ত। প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বে অর্থাৎ ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে 'হিন্দুরা' নিজেদের কোনো ঐক্যবদ্ধ ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে মনে করতো না। তারা তাদের পরিচয় দিতো বর্ণ-জাত, সম্প্রদায় ও অঞ্চল দ্বারা। এই ঐতিহাসিক পর্বে 'হিন্দুদের' চোখে 'মুসলিম' শব্দটির কোনো ধর্মীয় অর্থ ছিলো না। বরং শব্দটিকে জাতিগত, ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অর্থেই ব্যবহার করা হতো। সাধারণভাবে তুরস্ক থেকে আগতদের 'তুর্কি' বা 'তুরস্ক', পশ্চিম এশিয়া থেকে আগতদের 'শক', 'যবন' এবং জাত-বর্ণ ভিত্তিক সমাজের বাইরে অবস্থিতদের 'ম্লেচ্ছ' বলে ডাকা হতো। ঘটনা হলো সে সময়ে মুসলমান/মুসলিম শব্দটি ব্যবহারই হতো না। পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক পর্বেই এই শব্দ দুটির ব্যবহার শুরু হয় (Thapar. 2014 : 120)। বর্তমানেও হিন্দুত্ববাদীরা যাদের মুসলিম হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা চালায় তারাও সমগোত্রীয়, সমমাত্রিক ও একই চরিত্র ও বিশ্বাস সমন্বিত একটি ঐক্যবদ্ধ সম্প্রদায় নয়। তাদেরও একটি ধারণার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। 'হিন্দু'দের মতোই 'মুসলিম'রাও শিয়া-সুন্নি-হানাফি-কাদরিয়া-চিস্তিয়া-আউলিয়া ইত্যাদি নানাভাগে বিভক্ত বিভিন্ন ধরনের জাতে। বিভাজন রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক ইসলাম ও লোকায়ত ইসলামের মধ্যে। এই বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করে হিন্দুত্ববাদীদের মতো গোঁড়া ইসলামপন্থীরা সকলকে একটি বাক্সের মধ্যে পুরে একটি ঐক্যবদ্ধ সম্প্রদায় স্থাপনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আর এইভাবেই 'হিন্দুধর্ম' ও 'মুসলিম ধর্ম' নির্মাণের মধ্যে দিয়ে চলছে মিথ্যা 'আত্ম' ও 'অপর' নির্মাণের প্রচেষ্টা। এখানে একটি আংশিক (ধর্ম) পরিচয়কেই অন্য পরিচয়ের ঊর্ধ্বে বসানো হচ্ছে। ফলে দরিদ্র, বঞ্চিত, অপমানিত সমাজের নিম্নে থাকা 'হিন্দু' ও 'মুসলিমে'র মধ্যে জন্ম নিচ্ছে বৈরিতার অথচ তাদের স্বার্থ প্রায় সব দিক থেকেই এক ও সদৃশ।

৪

জাতীয়তাবাদের আর একটি উপাদান— দেশপ্রেম/দেশভক্তি। দেশ প্রেম হলো নিজের নৃকুল গোষ্ঠী বা দেশ নামক ভূখণ্ডের জন্য মানসিক টান বা ভালোবাসা। এর প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি আনুগত্য এবং এগুলিকে রক্ষা করার জন্য উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আগ্রহ। দেশপ্রেম তাই একটি নির্দিষ্ট ধরনের মানসিক ভাবাবেগ। জাতীয়তাবাদের আবির্ভাবের বহু পূর্বেই দেশপ্রেম-এর আবির্ভাব। এদিক থেকে এটি একটি প্রাক্-আধুনিক ধারণা। জাতীয়তাবাদের মধ্যে এই ভাবাবেগের অন্তর্ভুক্তিকরণ

ঘটে। এরই পাশাপাশি জাতীয়তাবাদের মধ্যে আবির্ভূত হয় বিদেশি লোকজন এবং বিদেশি ভাবধারা সম্পর্কে এক ধরনের ভয় বা ঘৃণার মনোভাব, যাকে xenophobia বলা হয়।

ফ্যাসিবাদী চিন্তা যে দেশপ্রেম/দেশভক্তিকে অনুমোদন করে, তা হলো চরম, নিঃশর্ত ও একমুখী আনুগত্য। অর্থাৎ শাসক, রাষ্ট্র ও সরকারের প্রতি আনুগত্য। রাষ্ট্র, সরকার, সামরিক বাহিনী, শাসককেই দেশ হিসেবে এখানে উপস্থিত করা হয়। এদের প্রতি সমর্থন হবে শর্তহীন ও প্রশ্নহীন। এদের স্বার্থই হবে সকল স্বার্থের ঊর্ধ্বে। হিন্দুত্ববাদীরা এই উগ্র দেশপ্রেমের সঙ্গে মিশিয়ে দেয় ধর্মগ্রন্থ, ধর্মীয় প্রতীক, ধর্মীয় আচার-আচরণ ও ধর্মীয় ইতিহাস। দেশপ্রেম/দেশভক্তি রূপান্তরিত হয় ধর্মভক্তিতে। এবং এভাবেই দেশভক্তিকে একটি চরম জায়গায় নিয়ে যেতে চায়।

ভারতীয় ফ্যাসিস্টরা দেশভক্তির বিপরীতে দাঁড় করায় দেশদ্রোহকে। উগ্র ও অন্ধ দেশভক্তির বিরোধিতার মানেই দেশদ্রোহিতা। হিন্দুত্ববাদীদের সমীকরণটি হলো : ভারত একটি হিন্দু জাতির দেশ। ভারত ও হিন্দু সমার্থক। ভারতে থাকতে গেলে দেশপ্রেমিক হতে হবে অর্থাৎ হিন্দু প্রেমিক হতে হবে। দেশপ্রেমের অর্থ গৈরিক ফ্যাসিবাদ ও তার নেতাদের নিঃশর্ত সমর্থন জানানো, সরকারের সমালোচনা না করা, ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রতীকগুলিকে নির্বিচারে গ্রহণ করা এবং দলিত-মুসলিম-খ্রিশ্চান-কমিউনিস্ট বিরোধী হওয়া। অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে গণতন্ত্র বিরোধী হওয়া। আর যে ব্যক্তি এই পথ গ্রহণ করবে না, তাকেই চিহ্নিত করা হবে দেশদ্রোহী হিসেবে।

এখানে মজার কথা হলো, RSS-BJP সহ নানা ধরনের হিন্দুত্ববাদীরা নিজেদের সব থেকে বড় দেশভক্ত/দেশপ্রেমিক বলে প্রচার করে; অথচ তাদের ইতিহাস হলো কালিমালিপ্ত বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস, ব্রিটিশ ভক্তির ইতিহাস। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত RSS কখনোই স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেয়নি। এদের লক্ষ্য ছিলো হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, মনুসংহিতাকে ভারতের সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করা। এদের শত্রু ছিলো মুসলমানেরা, ব্রিটিশরা নয়। RSS-এর তাত্ত্বিক গুরু সাভারকর কতটা ব্রিটিশ অনুগত ছিলেন, তা ব্রিটিশ সরকারের কাছে লেখা 'ক্ষমা ভিক্ষার আবেদন' পড়লেই বোঝা যায়। তিনি ১৯১৩-র একটি চিঠিতে লিখেছেন :

> ... সরকার [ব্রিটিশ সরকার] যদি তাঁদের বহুমুখী দয়ার দানে আমাকে একটু মুক্ত করে দেন তবে আমি আর কিছু পারি বা না পারি চিরদিন সাংবিধানিক প্রগতি এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের অবিচলিত প্রচারক হয়ে থাকব।
> (নুরানি। ২০১৭ : ১২৫)।

RSS-এর আর এক গুরু গোলওয়ালকরের একটি বক্তৃতাতে পাওয়া যাবে স্বাধীনতা সংগ্রামকে ছোটো করার প্রচেষ্টা :

> ইংরেজদের তাড়িয়ে দেশ স্বাধীন করার অনুপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে বহু মানুষ কাজ করে গেছেন। ইংরেজরা আনুষ্ঠানিকভাবে চলে যাওয়ার পর এই অনুপ্রেরণা শিথিল হয়ে পড়েছে। সত্যি বলতে কী, এত অনুপ্রেরণার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। মনে রাখা দরকার, আমরা আমাদের অঙ্গীকারে ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করার সাহায্যে দেশের স্বাধীনতার কথা বলেছিলাম। সেখানে ইংরেজদের চলে যাওয়া সংক্রান্ত কোনও কথা ছিল না। (উদ্ধৃত : ইসলাম। ২০১৭ : ৩২-৩৩)।

এই হিন্দুত্ববাদীরা (RSS ও অন্যান্যরা) গান্ধির হত্যাকাণ্ডের পর আনন্দ প্রকাশ করে মিষ্টি

বিতরণ করেছিলো বলে সর্দার প্যাটেল জানিয়েছেন। ১৯৪৮-এ ভারত সরকার RSS-কে নিষিদ্ধ করার কারণ হিসেবে বলে :

> সংঘের [RSS] সদস্যরা অবাঞ্ছিত ও বিপজ্জনক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। দেখা গেছে দেশের বিভিন্ন অংশে অগ্নিসংযোগ, লুঠতরাজ, ডাকাতি ও হত্যা এবং অবৈধ অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের মতো হিংসাত্মক কার্যকলাপে যুক্ত থেকেছে আর এস এসের সদস্যরা। সন্ত্রাসবাদী পথ অবলম্বন করা, আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করা, সরকারের প্রতি আনুগত্যহীন হয়ে ওঠা এবং পুলিশ ও মিলিটারির বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যাপারে মানুষকে প্ররোচিত করার মতো লিফলেট বিলি করতে দেখা গেছে তাদের। (উদ্ধৃত : পূর্বোক্ত : ২৫-২৬)।

১৯৪৭-এর ক্ষমতা হস্তান্তরের পরেই হিন্দুত্ববাদীদের দাবি ছিলো— তেরঙ্গা ঝান্ডার বদলে ভাগোয়া ঝান্ডার ব্যবহার করতে হবে এবং সংবিধান হিসেবে মনুসংহিতাকে গ্রহণ করতে হবে।

৫

জাতীয়তাবাদকে জাতীয় ঐতিহ্য ও জাতির ইতিহাসকে গড়ে তুলতে হয় বা নির্মাণ করতে হয়। অর্থাৎ জনগণের সামনে এমনভাবে ইতিহাস, অতীত-ঐতিহ্যকে ব্যাখ্যা করা হয় যেন তাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি, বিশ্বাস, ভাবধারা দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে অস্তিত্বশীল এবং কার্যকর। অতীতের এই স্মৃতি জাগিয়ে তোলার মধ্যে দিয়ে জনগণের মধ্যে ঐক্যের অনুভূতি গড়ে তোলার চেষ্টা হয়। এই যৌথ স্মৃতি নির্মাণকে আরও শক্তিশালী করা হয় এর সঙ্গে গর্ব ও মহত্বকে সংযুক্ত করে। যেমন, 'আমাদের অতীত ইতিহাস এক। সে ইতিহাস মহৎ ও শ্রেষ্ঠ' ইত্যাদি ইত্যাদি। পাশাপাশি অন্য সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী (অপর) সম্পর্ক গড়ে তোলা হয় ঘৃণার মনোভাব। জাপানে বিকশিত জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ :

> . . . এখন পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের প্রভাবের ফলে একেবারে শিশুকাল থেকেই সমগ্র জনগণের মনে সবরকম ঘৃণা ও উচ্চাশা জাগিয়ে তোলার জন্য শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এই কাজ করা হচ্ছে ইতিহাসের অর্ধসত্য ও অসত্য ব্যাখ্যান করে অন্য জাতিগুলির সম্বন্ধে বিরামহীন ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে এবং তাদের সম্পর্কে প্রতিকূল কৃষ্টি গড়ে তুলে। অনেক সময় মানবতার খাতিরে দ্রুত ভুলে যাওয়া উচিত এমন সব মিথ্যা ঘটনার স্মারক গড়ে তোলা হয় যা এইভাবে প্রতিবেশী জাতি ও অন্যান্য জাতি সম্বন্ধে অশুভ প্রতিবন্ধক বিরামহীন ভাবে প্রচার করা হয়। এই ধরনের কাজের অর্থ হ'ল মনুষ্যত্বের উৎসমুখ বিষাক্ত করে তোলা। এর ফলে আমাদের মহান ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের আদর্শগুলি নষ্ট হয়। চরম স্বার্থপরতা জগতের সকল জাতির বিশ্বজনীন ধর্ম হিসেবে সমর্থন পায়। (ঠাকুর। ২০১২ : ৫১)।

গৈরিক ফ্যাসিস্টরা ঠিক এই কাজটাই করে চলেছে। তারা ভারতীয় সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, সমন্বয়ী চরিত্র ও মিশ্রিত ভাবধারা ও সভ্যতাকে নানাভাবে আক্রমণ করছে এবং অতীত ভারতকে ব্যাখ্যা ও পুনঃব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে এমনভাবে নির্মাণ করছে যা ভারতীয় সংস্কৃতির একেবারে বিপরীত এবং অবশ্যই মানবতাবিরোধী। এই কাজে তারা ব্যবহার করছে নিজস্ব সংগঠন, প্রচার পুস্তিকা,

সত্তা সমিতি, বিদ্যালয়, পাঠচক্র কর্মশালা ইত্যাদি। বিদ্যালয় ও কলেজগুলির পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন ছাড়াও সংবাদপত্র, দূরদর্শন, চলচ্চিত্র সহ অন্যান্য মাধ্যমগুলিকে ব্যবহার করে ভারতীয় সংস্কৃতির সদর্থক দিকগুলিকে এরা একদিকে ধ্বংস করতে চাইছে আর অন্যদিকে ভারতীয় সভ্যতার কাল্পনিক গরিমা প্রচার করে চলেছে। তৈরি করছে এক কাল্পনিক সম্প্রদায়ের গল্প। মিথ্যা ইতিহাস, কাল্পনিক সম্প্রদায়, কাল্পনিক ঐতিহ্যের প্রচারের মধ্যে দিয়ে জন্ম দিতে চাইছে এক কাল্পনিক যৌথ স্মৃতি। যেমন, প্রাচীন 'হিন্দু জাতি'র ধারণা ও তার ইতিহাস। মুসলিম যুগে এই 'হিন্দুজাতি' মুসলিমদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছিলো, আজ হিন্দুদের জেগে ওঠবার সময় ইত্যাদি ইত্যাদি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আক্রমণ করা হচ্ছে নানাভাবে। গঠনগত দিক থেকে যেমন নানা পরিবর্তন আনা হচ্ছে, তেমনি পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে পাঠ্যক্রমেও। প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান হিসেবে বসানো হচ্ছে মার্কামারা ও অযোগ্য হিন্দুত্ববাদীদের। পাঠ্য বিষয়কে হিন্দুত্বের ছাঁচে ঢালাই করা হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে হিন্দুত্ববাদী 'শিক্ষাবিদ' দীননাথ বাত্রার বই-এর কথা উল্লেখ করা যায়। দীননাথ বাত্রার মিথ্যা তথ্যে পরিপূর্ণ সাম্প্রদায়িকতাবাদী গ্রন্থ 'তেজময় ভারত' গুজরাট সরকার সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে অবশ্যপাঠ্য করেছে। এই ১২৫ পৃষ্ঠার বইটি নানারকম আশ্চর্য তথ্যে (!) ঠাসা। পাঠক পড়তে পড়তে প্রচুর হাসির খোরাক পাবেন, তবে জ্ঞান ও যুক্তিবোধ কতটা বৃদ্ধি পাবে তা বলা মুশকিল। বাত্রা তাঁর বইতে লিখেছেন যে, স্টেম সেল সংক্রান্ত গবেষণায় আমেরিকা কৃতিত্ব নেবার চেষ্টা করলেও, প্রাচীন মহাভারতেরই এর কথা পাওয়া যায়। গান্ধারী যখন দু'বছর পরেও গর্ভবতী হতে পারছিলো না, তখন তিনি তাঁর গর্ভপাত ঘটান। গর্ভ থেকে একতাল মাংসপিণ্ড বেরিয়ে আসে। তখন ঋষি দ্বৈপায়নকে ডাকা হয়। তিনি এই একতাল মাংসপিণ্ডকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করেন এবং সুনির্দিষ্ট কিছু ওষুধ জলের সঙ্গে মিশিয়ে মাংসের তালটিকে একটি জলাধারে রাখেন। তারপর সেই বিশাল মাংসের তালটি একশোটি ভাগে ভাগ করে ঘি-পূর্ণ একশোটি পৃথক পৃথক জলাধারে মাংসের তালগুলি দু'বছরের জন্য রেখে দেন। দু'বছর বাদে এগুলি থেকে ১০০ জন কৌরবের জন্ম হয়। (তেজময় ভারত। পৃ. ৯২-৯৩। দ্রষ্টব্য: চৌধুরী। ২০১৫ : ১৪)। এরকম হাজার একটা আজগুবি জিনিসপত্র হিন্দুত্ববাদী বইগুলিতে ছড়িয়ে আছে।

পাঠ্যপুস্তক থেকে বহু অংশ বাদ দেওয়াটাও এই কর্মসূচির একটি অংশ। অধ্যাপক রোমিলা থাপার, রামশরণ শর্মা থেকে শুরু করে বহু খ্যাতনামা ঐতিহাসিকের রচনার কিছু কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। (Hassan. 2008 : 246-252)। কারণ এই অংশগুলি হিন্দুত্ববাদী ভাবধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বাতিল করা হয়েছে অধ্যাপক বিপান চন্দ্রের সাম্প্রদায়িকতা সংক্রান্ত গ্রন্থ। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান ও আসামের বিদ্যালয়গুলিতে বাদ পড়েছে রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগরের রচনা। একদিকে যেমন বৌদ্ধিক দিক থেকে হিন্দুত্ববাদীরা আক্রমণ চালাচ্ছে তেমনি সরাসরি হত্যা করছে মানবতাবাদী, মার্কসবাদী, যুক্তিবাদী ও আন্বেদকরবাদীদের উপর। ডা. নরেন্দ্র সাভারকর, অধ্যাপক কলবুর্গী, গোবিন্দ পালনসারে, গৌরী লংকেশকে প্রাণ দিতে হয়েছে এই গৈরিক ফ্যাসিস্টদের হাতে। (চলবে)

তরুণকুমার দে

ব্রজেন্দ্রকুমারের যাত্রাপালায় নারী-বিবেক (১)

যাত্রাভিনয়ে বিবেক ছিল কিছুদিন আগে পর্যন্ত, অবিচ্ছেদ্য প্রধান অংশ, যাকে বাদ দিলে যাত্রাভিনয় তার 'যাত্রাত্ব' হারিয়ে ফেলবে— এমনই ভাবা হতো। শুনেছি এক সময়ে যাত্রাদলগুলোতে গান গাইতে পারতেন, এমন শিল্পী অনেক থাকতেন। অহিভূষণ ভট্টাচার্যের বিখ্যাত 'সুরথ উদ্ধার গীতাভিনয়'-এ রাজা সুরথকেও গান গাইতে দেখা যেত। রাজার গান ছিল আটটি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অভিনীত পণ্ডিত হারাধন রায়ের 'ধর্মের জয়' পালাতে দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে দাঁড়িয়ে ভগ্নউরু দুর্যোধনকেও গান গাইতে দেখা যেত। পরবর্তীকালে নাটকীয়তা আনবার জন্য, পালাভিনয়ে সময়সংক্ষেপ করবার প্রয়োজন এবং গায়কসংখ্যা কমে যাবার ফলে যাত্রাপালায় অত চরিত্রের গান গাইবার ব্যবস্থা থাকত না। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি পেশাদার যাত্রাদলেই তিন বা চারজন উদাত্ত কণ্ঠের অধিকারী সুগায়ক থাকতেন। ১৯৮০ পর্যন্তও কোন কোন দলে দুজন গায়ক থাকতেন।

এই গায়কদের গানের প্রয়োগ হত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। যেমন :

১. নায়ক বা সৎ কোন বিশেষ চরিত্রের ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া কিংবা তাকে ভাল কাজে উৎসাহ দেওয়া।
২. খলনায়কের খারাপ কাজের সমালোচনা করে, তাকে সৎপথে নিয়ে আসবার চেষ্টা করা।
৩. নায়ক বা খলনায়ক অথবা অন্য কোন নারী/পুরুষ চরিত্রের কাছে তাদের অদূর ভবিষ্যতের ভাল বা মন্দ অবস্থার ইঙ্গিত দেওয়া।
৪. কোন চরিত্রের অতীতের সুখ বা দুঃখ মিশ্রিত স্মৃতি উস্‌কে দেওয়া।
৫. খল নায়ক বা নায়ককে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে বাধা দেওয়া বা উৎসাহিত করা।
৬. বিভ্রান্ত চরিত্রকে মুক্তির পথ দেখানো।
৭. দেশপ্রেম বা আর্তত্রাণে নায়ককে উদ্বুদ্ধ করা। দেশপ্রেম প্রকাশের জন্য Marching Song ব্যবহার করা।
৮. দেশ বা রাজ্য অথবা পরিবারের অবস্থা বর্ণনা করা।

যাত্রায় বিবেকের গান প্রায়ই সোচ্চার হতো। একটা কারণ ছিল অভিনয়ের পরিবেশ। রাত্রে আসরের চারদিকে দর্শক বা শ্রোতারা বসত। সংখ্যা কত হবে, কেউ আগে বুঝতে পারত না। খালি গলায় সবাইকে গান শোনাতে হবে। আবার গানের মাধুর্যও বজায় রাখতে হবে। এই দিকগুলো গীতিকার (সাধারণত পালাকারই গীতিকার) হতেন। সুরকার এবং গায়ক— তিনজনই বিশেষভাবে মনে রাখতে হত। এছাড়া বিবেককে প্রায়ই সাজঘরের দরজা থেকেই গান গাইতে গাইতে আসরে প্রবেশ করতে হতো।

নারী বিবেকের পদধ্বনি

যাত্রা যখন গীতাভিনয় হয়নি, তখনই বিবেকের অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল। যাত্রায় চিরদিন অধর্ম তথা অসৎ পক্ষের পরাজয় এবং ধর্ম তথা সত্যনিষ্ঠের জয় ঘোষিত হয়েছে। অসৎকে সৎপথে

ফিরিয়ে আনবার জন্য মাঝে মাঝে Convincing গান (পরবর্তীকালে সংলাপ) থাকতো। গীতাভিনয় প্রচলিত হবার পরে মতিলাল রায়ের আধ্যাত্মিক extempore speech এবং স্বদেশি যাত্রা প্রচলিত হবার পরে দেশপ্রেম সম্পৃক্ত তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ও গান দেশবাসীকে সঠিক পথে চালনা করবার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হতো। অহিভূষণের 'সুরথ উদ্ধার গীতাভিনয়' এর দিবদাস রাজাকে তার ভুল সিদ্ধান্ত নেবার সময়ে সতর্ক করে দিতো চক্রান্তকারী সম্পর্কে। চক্রান্তের শিকার ছোট রাজকুমারকে রাজার আদেশে বিষ দেওয়া হয়েছিল। তাতেও তার মৃত্যু না হওয়ায় তাকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। সে যখন বনে যাচ্ছিল, তখন দিবদাস তাকে পরামর্শ দিয়েছিল গানের মাধ্যমে। বড় রাজপুত্র ছোট রাজপুত্রকে খুঁজতে যাবে এমন সময়ে দিবদাস তাকে জানিয়েছিল— 'তোমার আপন বলতে কেউ নাই রে ভাই,...' বন্দি সেনাপতি মুক্ত হয়ে চক্রান্তকারীকে বন্দি করলে দিবদাস সেনাপতির কাজের প্রশংসা করে ছিল— 'হুমো বাঘ ভেঙেছে খাঁচা।'

এই দিবদাসকেই আদর্শ মেনে নিয়ে পরবর্তীকালে বিবেককে আরও নানা নাট্যমুহূর্তে গান গাওয়ানো হয়েছিল। দিবদাস ছিল নিরুদ্দিষ্ট মন্ত্রীর ছেলে। বড় ফণিভূষণের বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের রচনা 'ভাগ্যদেবী' পালায় বিবেক লক্ষণান্ত গান গেয়েছিল বেতাল (পিশাচ), সনাতন (ছদ্মবেশী বিবেক), সমুদ্র, বাঁশরী (ছদ্মবেশী নারায়ণ) ইত্যাদি। এদের গানগুলোর অধিকাংশই ছিল বিবেক-চরিত্রের উপযোগী। লক্ষণীয় সনাতন চরিত্রটির পরিচয় দেওয়া হয়েছিল 'ছদ্মবেশী বিবেক' রূপে। বাঁশরী যেহেতু ছদ্মবেশী নারায়ণ এবং বেতাল যেহেতু পিশাচ, তাই তারা ছিল সর্বত্রগামী। এই পালাতে ভাগ্যদেবীর মুখে চারটি গান ছিল। অবশ্য ওই গান বিবেক লক্ষণান্ত— এটা খানিকটা জোর করেই বলতে হয়। কিন্তু তবুও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভাগ্যদেবী ছিল নারী চরিত্র এবং দেবী হবার জন্য সর্বত্রগামী।

বড় ফণিভূষণ তাঁর 'মেদিনী' পালাতে সুখ, দুঃখ, শ্রীচৈতন্য, যোগিয়া, লোভ, যোগনিদ্রা ও প্রবৃত্তির মুখে গান বসিয়েছিলেন। গানগুলোর কয়েকটি বিবেকের গানের লক্ষণে পরিপূর্ণ। লক্ষ্য করবার বিষয়, যোগনিদ্রা এবং প্রবৃত্তিকে নারী চরিত্র বলা হয়েছিল। আরও আশ্চর্যের বিষয় যোগিয়া, লোভ এবং যোগনিদ্রার মুখে বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে দশটি, ছটি এবং সাতটি গান। যোগনিদ্রার দুটি গান এবং যোগিয়ার একটি গান ছিল দ্বৈত সংগীত। এছাড়া শ্রীচৈতন্য, সুখ ও দুঃখ গেয়েছিল যথাক্রমে তিনটি, দুটি ও একটি গান। প্রবৃত্তি আর পঞ্চভূত একটি করে গান গেয়েছিল। কিন্তু নাটকে সুমতি ও কুমতি (দৈত্য মধুররানি) এবং বিবেক থাকলেও তাদের মুখে কোন গান বসানো হয়নি।

পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'জয়মাল্য' পালায় জগা পাগলা (পুরুষ), শান্তি (পুরুষ), কুবুদ্ধি এবং সুধা (নারী)-র মুখে গান বসিয়েছিলেন যথাক্রমে ছটি, তিনটি, দুটি এবং পাঁচটি। এদের মধ্যে জগা পাগলা-ই ছিল যথার্থ বিবেক। তার মুখের কোন কোন গানও ছিল দিবদাসের গানের দ্বারা প্রভাবিত। সুধার গানের মধ্যে দুর্জন সিংহ তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে উদ্যত হলে গাওয়া— 'সম্বর শাব ওহে বীরবর', উলুপী অর্জুনের গায়ে অস্ত্রাঘাত করবার সময়ে গাওয়া— 'ছি ছি ছি, ললনা, কুলের অঙ্গনা স্বামীবধে কেন বাসনা' এবং উলুপী মৃতসঞ্জীবনী মণি গঙ্গায় ফেলে দিতে উদ্যত হলে গাওয়া— 'স্বপনের হাত ধরি। / কামনার পথে চললো কামিনি, আশার আলোক হেরি' ছিল বিবেকেরই গান।

(এখানে বলে রাখা ভাল— এক সময়ে যাত্রাদলে বিবেকের চরিত্রাভিনেতাকে 'গাইয়ে' বলা হত। ওই শব্দটি বিবেক অর্থে ব্যবহৃত হবে এই প্রবন্ধে।)

সূত্রপাত

'স্বর্ণলংকা' ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র প্রথম অভিনীত পালা। পালাটি প্রথমে অভিনীত হয়েছিল সৌখিন যাত্রা সম্প্রদায় 'বাণী নাট্য সমাজ'-এ। কিছুদিনের মধ্যে 'স্বর্ণলংকা'-র জনপ্রিয়তাকে আশ্রয় করে দলটি পেশাদার যাত্রাদলে রূপান্তরিত হয়েছিল। 'স্বর্ণলংকা'র 'বিবেক' ছিল সত্যশরণ। তার পরিচয় ছিল 'ছদ্মবেশী জ্ঞান'। পালায় সত্যশরণের অনেকগুলো গান ছিল। মুদ্রণের সময়ে কিছু কিছু বাদ দেওয়া হয়েছিল। তৃতীয় সংস্করণে সত্যশরণের মুখে ছটি গান রাখা হয়েছিল। গানগুলো যে সব নাট্যমুহূর্তে প্রযুক্ত হয়েছিল, সেগুলো এইরকম :

(১) রাবণের কাছে অপমানিত হয়েছে বিভীষণ। সত্যশরণ তাকে সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিচ্ছে। গানের বাণী ছিল এই রকম :

সহজ পথে চল চলে।
কেন ভাবিস, ভাবনা মিছে, পুড়িস নে আর পলে পলে।।
ভয় ভাবনা বিষাদ বেদন, হাসি অশ্রু করম মনন,
ঢেলে দে ভাই নিঃশেষে সব বিশ্বপতির চরণতলে।।
সে যে বিশ্বশরণ ত্রিতাপহরণ, পতিতপাবন রামনারায়ণ,
তোর কাঁধের ঝোলা লঘু হবে, তাহার চরণ-পরশ পেলে।।

(২) দ্বিতীয় গানটি অশোকবনে বন্দিনী সীতাকে মানসিক শক্তি দেবার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়েছিল। গানের বাণী ছিল :

ওমা, ভাসিস কেন নয়ন জলে?
একটি তোমার অশ্রু বিন্দু, গড়বে অপার বিশাল সিন্ধু,
একটি তোমার দীর্ঘশ্বাসে সোনার লংকা যাবে জ্বলে।।

(৩) তৃতীয় গানটি গাইবার আগে রাম-লক্ষ্মণ নাগপাশে আবদ্ধ হয়েছিল। হনুমান বিষম রাগে ধ্বংসাত্মক রূপ নিতে যাচ্ছিল। তখন সত্যশরণ গেয়েছিল— 'রাঘব যে তোর মৃত্যুঞ্জয়ী, মরণ কি তার হতে পারে?'

(৪) চতুর্থ গানটি রামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইহজগতের অনিত্যতা জানিয়েছিল।

(৫) পরাজয় এবং ধ্বংসের কিনারায় পৌঁছে রাবণ আক্ষেপ করছে এমন সময়ে পঞ্চম গানটি ব্যবহৃত হয়েছিল। গানটিতে বলা হয়েছিল :

তোর দিন ফুরিয়ে এল।
তোর সুখের রবি ডুবে যায় রে জীবন-প্রদীপ নিভে গেল।।

(৬) শেষ গান তরণীসেনের মৃত্যুর পরে শবদাহের আগে গাওয়া হতো। এই গানটির বাণী কিছুটা ভাববাদী। গানটিতে বলা হয়েছিল : 'এমনি করে রাজা-প্রজা শ্মশান চিতায় শুয়ে রবে।"

১৯২৫-এ বা তারপরেও বেশ কিছুকাল যাত্রাদলে অনেক শিল্পীই থাকতেন, যাঁরা সুগায়ক ছিলেন। পালাগুলোতে, এমনকি আজ থেকে চল্লিশ বছর আগেও, দুজন 'বিবেক' গান গাইতেন।

'স্বর্ণলংকা' পালায় সিন্ধু, রাজলক্ষ্মী ইত্যাদি চরিত্রের মুখে গান প্রয়োগ করা হয়েছিল। 'স্বর্ণলংকা' পালার দ্বিতীয় 'গাইয়ে' ছিল 'উল্লাস'। মেঘনাদের মৃত্যুর পরে উল্লাস হতাশ হয়ে লংকা ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সে যাবার আগে নিয়তিকে বলেছিল :

নিয়তি তোরে নমস্কার।
তোর লক্ষ মরদ আঁচল ধরা কাছায় বাঁধা ত্রিসংসার,...

এই সাতটি গানের বাণীতে যথাক্রমে পথনির্দেশ, আশ্বাস, নায়কের শ্রেষ্ঠত্ব-বর্ণনা, নিদারুণ পরিণতির ইঙ্গিত, শোক এবং ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ বোঝানো হয়েছিল। কিন্তু উল্লাসের কণ্ঠে একটি গান ছিল কালনেমির রাবণ ধ্বংসের ষড়যন্ত্রের ভাবনার সময়ে। উল্লাসের ওই গানটি বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। গানে বলা হয়েছিল :

মামা তোমার কীর্তি চমৎকার।
তুমি ভাবছো বসে দিবানিশি (কবে) লংকা হবে ছারখার।
শমন তোমার চুলে ধরে টানছে পলে পল,
নরক হতে ডাক এসেছে চল্ চল্ চল্,
সিংহাসনের রঙিন নেশায়, বসে আছ ঘুঘুর বাসায়,
অচল অটল পাষাণ প্রায় সামনে মৃত্যু পারাবার।
অমর করেছে তোমায় মামীর অধর সুধার ধার।

এই গানটিতে পথ নির্দেশ নেই, অবস্থা বর্ণনাও নেই। নেই ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। এই গানে রয়েছে ষড়যন্ত্রকারী কালনেমির প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ। অবশ্যই প্রচ্ছন্ন রয়েছে ধিক্কার। সেই নিরিখে এই গানটি অহিভূষণ ভট্টাচার্যের 'সুরথ উদ্ধার গীতাভিনয়ে'-এর দিবদাসের গানের ধারা রক্ষা করেছিল। তবে দিবদাসের গানে রাজা যখন ভুল করছিল, তখন তাকে বারবার বলা হয়েছিল— 'আপন বুঝে চল এই বেলা।' উল্লাসের মুখ থেকে ব্যঙ্গই সরাসরি উৎসারিত হয়েছিল। কালনেমিকে তাঁর বার্ধক্যের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছিল ষড়যন্ত্র বন্ধ করে দেবার আশায়।

এছাড়া 'স্বর্ণলংকা' পালায় সিন্ধুর একটি গানও ছিল। সিন্ধু ছিল সমুদ্রের পুরুষ-প্রতীক।

কিন্তু স্বর্ণলংকায় একটি গান ছিল বিষণ্ণ রাজলক্ষ্মীর। তরণীসেন যুদ্ধে এলে গানটি শোনা যাচ্ছিল নেপথ্য থেকে। গানটিতে তরণীসেনকে আহ্বান করা হচ্ছিল পরলোকে নিয়ে যাবার জন্য :

বেলা যে চলে যায়।
খেলা ছেড়ে ধূলো ঝেড়ে, কোলের ছেলে কোলে আয়।
ধরার ধূলায় মলিন বরণ, মলিন আঁখি মলিন বদন,
বিভোল মায়ার স্বরূপ-রতন, প্রমত্ত মন ধূলো-খেলায়।
আঁধার এলো দিক ছাপিল, ঘরের ছেলে ঘরে আয়।

এই গানটি তরণীসেনকে অভিমন্যুর আদলে দেখিয়েছিল। অভিমন্যুকে বলা হয়েছে চন্দ্র। কোন অভিশাপে সে মানুষ হয়ে জন্ম নিয়েছিল। যুদ্ধে নিহত হয়ে সে আবার নিজের জায়গায় ফিরে গিয়েছিল। এখানে তরণীসেনও ওইরকম শাপভ্রষ্ট দেবতা— এমন ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। এই গানটি অশরীরী বিবেকেরই উপযুক্ত ছিল।

নারী 'গাইয়ে'র খতিয়ান'

ব্রজেন্দ্রকুমার পেশাদার যাত্রাদলের জন্য প্রথম যে যাত্রাপালাটি লিখেছিলেন ১৯৩১-এ, সেটির নাম 'বজ্রনাভ'। 'বজ্রনাভ' পালায় 'গাইয়ে' চরিত্র রেখেছিলেন (একালে বালক এবং 'গণ'-এর গান বাদে) চারটি : করালী, অশ্রু, রাজলক্ষ্মী এবং শ্রীধর। প্রথম তিনজন ছিল নারী। তাদের কণ্ঠে সঙ্গীত প্রয়োগ করা হয়েছিল যথাক্রমে চার, চার এবং একটি। অবশ্য করালী ও অশ্রুর একটি দ্বৈত সংগীতও ছিল।

পরের পালায় ব্রজেন্দ্রকুমার ছটি 'গাইয়ে' চরিত্র রেখেছিলেন। এদের মধ্যে চারটি অর্থাৎ গীতা, চিত্রলেখা, বসুন্ধরা ও মায়া ছিল নারী। পুরুষ 'গাইয়ে' রুদ্র ভৈরব এবং বিঘ্নলোচনের কণ্ঠে গান ছিল যথাক্রমে তিনটি এবং দুটি। উল্লিখিত নারী চরিত্রগুলোর মুখে গান দেওয়া হয়েছিল যথাক্রমে পাঁচ, তিন, তিন ও দুটি। বিঘ্নলোচনের দুটি এবং রুদ্রভৈরবের ছিল তিনটি গান। পালাটি খুবই বিখ্যাত হয়েছিল। আজও অনেকে এই বিখ্যাত 'প্রবীরার্জুন' পালার নাম করেন।

'বজ্রলাভ', 'প্রবীরার্জুন', 'লীলাবসান', 'বঙ্গবীর' ইত্যাদি পালার মত ব্রজেন্দ্রকুমারের 'রাজলক্ষ্মী' পালাও অভিনীত হয়েছিল গণেশ অপেরা পার্টিতে। 'রাজলক্ষ্মী'-র গাইয়ে ছিল বিজয়া (নারী), সত্যাশরণ (পুরুষ) এবং কালপুরুষ। শেষ দুটি চরিত্র গেয়েছিল যথাক্রমে তিনটি এবং দুটি গান। অন্যদিকে বিজয়ার মুখে দেওয়া হয়েছিল আটখানি গান।

ব্রজেন্দ্রকুমারের তিন অঙ্কের ছোট পালা 'রাজর্ষি' ভোলানাথ অপেরা পার্টিতে অভিনীত হয়েছিল। ওই পালাটি কিছু দৃশ্যাংশ সংযোজন করে মুদ্রণের পরে পেয়েছিল অভাবনীয় জনপ্রিয়তা। পালাটির তৃতীয় মুদ্রণ হয়েছিল ১৯৫২-তে। ওই পালার পুরুষ গাইয়ে চরিত্র ছিল গ্রহরাজ, দেবাশিস আর ভিক্ষুক। গ্রহরাজের মুখে তিনটি এবং দেবাশিসের মুখে দুটি গান দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে ভিক্ষুক গেয়েছিল একটি গান। নারী 'গাইয়ে' রাজলক্ষ্মী একটি গান গাইলেও অঞ্জলি গেয়েছিল সাতটি গান। লক্ষণীয় পুরুষ 'গাইয়ে'র চেয়ে বেশি গান নারী 'গাইয়ে' গেয়েছিল।

নট্ট কোম্পানি যাত্রা পার্টির জন্য লেখা 'গীতগোবিন্দ' (পালাটি 'ভক্ত কবি জয়দেব' নামেই পরিচিত) পালায় 'গাইয়ে' ছিল পাঁচটি : 'গীতাঞ্জলি ও মায়া [এরা নারী] এবং পরাগ, গোবিন্দ ও ভুণ্ডুলে (এরা পুরুষ)। নারী চরিত্র দুটি গান গেয়েছিল যথাক্রমে ছটি এবং একটি। অবশ্য গীতাঞ্জলির পাঁচটি গান একক সঙ্গীত হলেও, ষষ্ঠটি ছিল দ্বৈত কণ্ঠের। পুরুষ 'গাইয়ে'রা যথাক্রমে চারটি, দুটি এবং দুটি গান গান গেয়েছিল। গোবিন্দেরও একটি গান ছিল দ্বৈত সংগীত।

স্বাধীনতা আসবার পরেই মহাত্মা গাঁধীর নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল। সেই বছরেই নিউ গণেশ অপেরা পার্টিতে অভিনীত হয়েছিল ব্রজেন্দ্রকুমারের 'ধরার দেবতা' পালা। ওই পালার 'গাইয়ে' চরিত্র ছিল তিনটি : শহিদ, নন্দিনী এবং শ্রমিক। শ্রমিকের একটি গান ছাড়া ছিল দশটি গান, যার ছটিই প্রযুক্ত হয়েছিল নারী 'গাইয়ে' নন্দিনীর কণ্ঠে। বস্তুত ওই পালায় নন্দিনীই ছিল প্রধান বিবেক চরিত্র। একইভাবে 'রাজর্ষি'-র অঞ্জলি এবং 'প্রবীরার্জুন'-এর গীতাকে প্রধান বিবেক বলা যায়।

আরও পরে

পরবর্তীকালে 'প্লাবন' পালায় 'গাইয়ে' কবির চারটি এবং জয়দেবের দুটি গানের পাশাপাশি রাখা হয়েছিল মুক্তকেশীর দুটি গান। কবির গানগুলোর প্রথম দু'পংক্তি ছিল এই রকম :

(১) শিশু ত আর নয়রে তোরা, ডাকিস কেন মায়?
বুক ফুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়া আপন পায়।

বন্যা গ্রাম ভাসিয়ে দেবার পরে গ্রামবাসীদের নদীতে বাঁধ না দেবার জন্য শাসকের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে বলবার সময়ে ব্যবহৃত হয়েছিল এই গানটি।

(২) জগৎ জুড়ে চাইছে সবাই শান্তি ওরে শান্তি!
তোর কেন এ পাগলামি বল্ সর্বনাশা ভ্রান্তি!

জমিদার অন্যায়ের প্রতিবাদকারীদের দিকে আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে ধরবার সময়ে বাধা দিয়ে কবি এই গান গেয়েছিল, যা যাত্রার বিবেক করতো।

(৩) যোগ্য নেতার সন্ধান পাবার পরে নির্যাতিতদের দুরবস্থার সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছিল এই গানের মাধ্যমে কবি।

মানুষ এল, মানুষ এল, বাজা শঙ্খ বাজা,...
উচ্চ নীচের তফাৎ যত আজ হবে সব অপগত
দে দেখি সব অঞ্জলি দে বুকের রক্ত তাজা।

(৪) জীবের সেবায় শিব এল রে,
বরণ করে নে রে ঘরে,...

অত্যাচারের অবসান হবার সময়ে সাধারণ মানুষের আনন্দ-প্রকাশের সূচনা করেছিল কবি।

মুক্তকেশীর প্রথম গানটি প্রযুক্ত হয়েছিল জমিদার এবং তার লোকজনের সামনে। গ্রামে বন্যা হয়েছে, বন্যার্তদের আশ্রয় দেবার জন্য জমিদারের চণ্ডীমণ্ডপ আর নহবৎখানা চাওয়া হলে তিনি রেগে যান। তখন মুক্তকেশী এই গানটি গেয়েছিল :

ওরে তোরা দেখ্‌রি আয়,
এক মা তোদের হাজার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আঙিনায়।
পেটে তাদের নাইরে ভাত, পরণে নাই কানি,
জরামরণ অকালে দেয় সঘনে হাতছানি,
তুলে নেরে ওদের বুকে,
ফুটবে হাসি মায়ের মুখে,
অশ্রুজলে অঞ্জলি দে, মা বলে ওই ওদের পায়।

উল্লেখিত বন্যার ঘটনাটি ঘটেছিল দুর্গাপুজোর ঠিক আগে। মুক্তকেশীর গান রুষ্ট জমিদারের বিবেকের কাছে মানবিক আবেদন পৌঁছে দিয়েছিল।

বন্যার্তরা চণ্ডীমণ্ডপ আর নহবৎখানায় আশ্রয় নেওয়ায় জমিদারের দুর্গাপূজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। জমিদার এজন্য আক্ষেপ করছিলেন— 'কেন আজ মুখ ফেরালি মা?' মুক্তকেশী জানিয়েছিল—

ছেলেমেয়ে ক্ষুধায় জ্বলে, নাইক পেটে ভাত,
তোর ভোগে মা কেমন করে বাড়াবে দশ হাত?
গিলি না ত বুকে তুলে, টাকা খা তুই গুলে গুলে,
আস্তাকুঁড়ে ফেলে দে ভোগ, লাঠিতে কর বাজিমাৎ।
ঘরের দুয়ার বন্ধ করে 'আয় মা' বলে ডাকলে ওরে
আসবে কি মা মাটি ফুঁড়ে ও অভাগার জাত?

প্রতাপাদিত্য নিয়ে রচিত 'লৌহমানব' পালায় প্রধান 'গাইয়ে' ছিল নারী— ভৈরবী। তাঁর মুখে দেওয়া তিনটি গানই যথাযথভাবে ট্রাডিশন্যাল বিবেকের গান ছিল। [১৯৭০-এর প্রযোজনা ছিল এই পালা। লক্ষণীয়, গানের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল তিন দশকের মধ্যে।]

একটি গান ছিল ভুল বুঝে প্রতাপাদিত্য তাঁর স্নেহময় কাকা বসন্ত রায়কে হত্যা করবার পরে। তখন বসন্ত রায় মুহূর্যু, নাতনি (প্রতাপাদিত্যের মেয়ে) বিভা তাঁর শুশ্রূষা কচ্ছে, সেই সময়ে ভৈরবীর গান ছিল :

অকূল গাঙে ভাসিয়ে দিলাম রে, ও মাঝি মোর পানসী নাও,
(আমার) অবশ তনু, ও কাণ্ডারি, এবার তরী তুমি বাও।
...বিদায় দে গো ও মাটির মা,
ভুল ত্রুটি মোর ধরিস নে মা,
যাবার বেলা ধুলোমাটি অঙ্গে আমার বুলিয়ে দাও।

বিংশ শতাব্দী দ্বিতীয়ার্ধের যাত্রাপালায় বিবেকের কণ্ঠে বেদনাসূচক গান বিশেষ ঘটনার আগে বা পরে ব্যবহৃত হতো। যেমন 'কবি চন্দ্রাবতী' পালায় জয়চন্দ্র জুলেখাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে, এই খবর তার আশৈশবের বান্ধবী চন্দ্রাবতীর কাছে যে দৃশ্যে পৌঁছাতো, সেই দৃশ্যের শুরুই হতো এক বৈষ্ণবের গানের মাধ্যমে, যার প্রথম পংক্তি ছিল :

রাই কিশোরি, তোর শ্যাম চলে যায় মথুরায়...

ওই সময়ে ওই গান বিষাদ বিস্তার করে সামাজিক অব্যবস্থাকে আঘাত করতো। ওইখানে বিবেক আসন্ন বেদনাদায়ক মুহূর্তের নাট্যরস বিস্তারে সহায়তা করতো।

ভৈরবীর মুখে প্রথম গানটি ছিল উদ্দীপক :

মার নামে জেগে ওঠ্ দুরন্ত ছেলে সব,
দেশময় লেগে গেছে মরণ-মহোৎসব।
কে বলেছে ভীরু তোরা, কে বলেছে দুর্বল?
অঞ্জলি দে মায়েরে রক্তের শতদল,
তোদের গৃহের যারা,
করেছে তোদের কারা,
গলা টিপে থামিয়ে দে তাহাদের কলরব।
দেখিয়ে দে অরাতিরে,
তোরা ত মরিস নি রে,
জীবন্ত,— তোরা নস্ শব।

এই গানটি চারণ সম্রাট মুকুন্দদাসের 'বান্ এসেছে মরা গাঙে খুলতে হবে নাও' গানের সার্থক উত্তরসূরি। এই জাতীয় গান যাত্রাপালায় সবসময়েই ব্যবহৃত হয়েছে। 'রাজা দেবীদাস'-এর 'বাংলা জননীরা ওঠ্ জেগে ওঠ্, পুরুষের সাথে সাথে ছোট্ তবে ছোট্' এবং 'রাজদ্রোহী'-র 'জোর কদমে এগিয়ে চল!/বাঁচার মত বাঁচতে হবে, জ্যান্তে মরে কী ফল বল্, জাতীয় গানের সমগোত্রীয়।

ভৈরবীর অন্য গানটি নিঃসন্দেহে আক্ষরিক অর্থেই বিবেকের গান। প্রতাপাদিত্যের কাছে

অপমানিত হয়ে তার জামাই রামচন্দ্র শোধ তুলবার জন্য মোগল সেনাপতি মানসিংহের সঙ্গে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ভৈরবী রামচন্দ্রকে বাধা দিতে চাইছিল। গানের বাণী ছিল :

ওরে সুজন নাইয়া,
কাঁচ তুলে তুই দিসনে গেরো মাণিকটি হারাইয়া।
এ ভুল যখন বুঝবি ওরে,
ভাসবে রে বুক আঁখিলোরে,
দুঃখে শোকে কূল পাবি না, আসবে আঁধার ছাইয়া।
চিনে নে কে আপন বা পর,
কুকুর ছেড়ে ঠাকুরকে ধর,
সোনার তরী দিসনে বোকা অকূলে ভাসাইয়া।

এই জাতীয় গান 'দানবীর' পালাতেও ব্যবহৃত হয়েছিল যখন রাজা হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের আশ্রম পাহারা দিতে যাচ্ছিলেন। ওই সময়ে গ্রহরাজের মুখে ছিল এই গান :

ওরে অন্ধ!
ভুল করে তুই ভাঙিস নে রে
এমন মধুর জীবন-ছন্দ।

'গাইয়ে' ওই সময়ে দুঃখময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিতে চেয়েছিল। 'দানবীর' পালার প্রধান বিবেকে অঞ্জলিরও একটি গান ছিল ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিলোভী বিশ্বামিত্রকে ধিক্কার দিয়ে— 'কেন হায় মাখ্লি মুখে কালি?/আঁচলভরা রতনমাণিক অতল জলে দিলি ডালি?' তবে এই গানটিতে বাধা দেওয়ার বদলে ছিল তিরস্কার। 'স্বামীর ঘর' পালার কৃপালের গাওয়া গান— 'ওরে অকূল গাঙের যাত্রি।/ঈশান কোণে মেঘ জমেছে, সামনে চিররাত্রি।' অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে প্রজারা সমবেত হয়ে বিদ্রোহ করছে, সেই সময়ে ছিল ওই সাবধানবাণী।

'লৌহমানব' পালার বিশেষত্ব ছিল এই যে, সে পালার চারটি নারী চরিত্রের মধ্যে সব থেকে প্রাধান্য পেয়েছিল ভৈরবী। কয়ালী, অশ্রু, গীতা, চিত্রলেখা, বসুন্ধরা, গীতাঞ্জলি, এমন কি অঞ্জলিও পালায় ওই প্রাধান্য পায়নি। অঞ্জলি ও গীতাঞ্জলির অনেক সংলাপও ছিল, ছিল নাট্যঘটনায় ঘনিষ্ঠ অংশগ্রহণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওই সব চরিত্রগুলো পালার অন্য নারীচরিত্রের সমান গুরুত্ব পায়নি। ওইসব চরিত্র নারী-বিবেক হয়েই অবস্থান করতো। (চলবে)

'সাংস্কৃতিক সমসময়'-এর জন্য

- তথ্যঋদ্ধ, সাহসী এবং বলিষ্ঠ বক্তব্যসম্পন্ন প্রবন্ধ পাঠান
- প্রত্যয়দীপ্ত অথচ কাব্যগুণসম্পন্ন কবিতা পাঠান
- গণমানুষ ও গণসংগ্রামের অনুপূরক গল্প পাঠান

নিছক যান্ত্রিকতা ও শ্লোগানসর্বস্বতা নয়,

দেবাশিস চক্রবর্তী

‘কথা ও কলম’— উত্তরবঙ্গের প্রথম নাট্য আন্দোলন (২)

সঠিক সময়েই আরম্ভ হয়ে গেল ‘লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার’ নাটকের মহড়া এবং নির্দিষ্ট দিনে মঞ্চস্থ হবার বন্দোবস্ত। মিত্র সম্মিলনী মঞ্চ ছাড়া সেইসময়ে শহরে (অবশ্য শহর বলতে তো ছোট্ট একটি জনপদ যার দুটি প্রধান সড়ক ঘিরেই সবকিছু) মাঝখানের এই নাট্যমঞ্চটিই ছিল বিনোদনের উপযুক্ত। একেবারে হিলকার্ট রোডের ওপর। এর আগের নাটকের বেশিরভাগ ‘কথা ও কলম’ উপস্থাপিত করেছে এই প্রেক্ষাগৃহে। একরাত নয়, দু রাত্তির অভিনীত হবে। তারিখ ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি ১৯৫৯ সাল। ঠিক একবছর আগেই এই নাট্যদলের প্রথম নাটক এই মঞ্চেই সাফল্যের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছিল দর্শকদের সামনে। সেইসময়ে এই শহরে শীতের প্রকোপ ছিল দারুণ। তবে, শিলিগুড়ির হাজার তিরিশেক মানুষের মধ্যে নাটক বা যাত্রার প্রতি আকর্ষণ ছিল এতটাই যে শীত তাঁদের কাছে কিছুই ছিলনা। আর তুলসী লাহিড়ির মত দিকপাল নট ও নাট্যকারের নাটক বলে কথা!

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, এই নাটকটি ছিল তখন পাণ্ডুলিপিতে। তুলসীবাবু, পরীক্ষা করবার জন্যেই ‘লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার’এর পাণ্ডুলিপি নিয়ে মঞ্চে অবতীর্ণ হবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। আর এই নাটকটিই ছিল তাঁর শেষ রচিত নাটক। এখানে নিজে অভিনয়, পরিচালনা দুটোই করেছিলেন এই মহান নাট্যব্যক্তিত্ব। ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি ‘কথা ও কলম’ তাদের ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে আরম্ভ করে অভিনয়। এক বাস্তুহারা পরিবারের মর্মন্তুদ কাহিনি নিয়ে নাটক। মূল চরিত্রে ছিলেন তুলসীবাবু নিজে, ছায়া চৌধুরী, সুভাষ বসু, প্রতাপ চক্রবর্তী প্রমুখ জনা তিরিশেক কলাকুশলী। তার ওপর অন্যান্য সহযোগীরা। এতবড় একটা ঘটনা ঘটিয়ে দেওয়া যে সে ব্যাপার নয়! কিন্তু সাফল্যের চূড়ান্ত নিদর্শন দেখিয়ে শিলিগুড়ির মত একটি সদ্য গড়ে ওঠা উদ্বাস্তু অধ্যুষিত আধাশহরে ‘কথা ও কলম’এর মত একেবারে নবীন একটি প্রকৃত নাট্যগোষ্ঠী যে অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখাতে পেরেছিল তার কোনো তুলনা হয়না। তুলসী লাহিড়ি নাটকের শেষে বলেছিলেন, এমন সাফল্য তিনি আশাই করতে পারেননি। একটি নতুন নাট্যদলের যে এত নিষ্ঠা ও করে দেখাবার ক্ষমতা, তা সচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা যায়না। অথচ, নাটকের পরে নিজে হাতে একটি দামি শাল উপহার দিয়ে যে ছায়া চৌধুরীকে (নায়িকা) তিনি সম্মানিত করলেন, তাকেই মহড়া চলার সময়ে ঠিকঠাক হচ্ছিলনা বলে গালে চড় কষিয়ে দিয়েছিলেন একরাতে। আর একজন পেয়েছিলেন সম্মান, তিনি প্রতাপ চক্রবর্তী।

‘লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার’ একটি মাইলস্টোন হয়ে আজও শিলিগুড়ির নাট্যামোদীর কাছে উজ্জ্বল। এই শহরের নাটকের ইতিহাস লিখতে গেলে ‘কথা ও কলম’এর এই উপস্থাপনা অবিস্মরণীয়, কেননা তুলসী লাহিড়ির মত বাংলা নাটকের মহান ব্যক্তির পরিচালনা ও অভিনয়ে সমৃদ্ধ তাঁর নিজের লেখা অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি নাটকের প্রথম অভিনয় পরবর্তীকালে আর হয়নি। যদিও এই নাট্যদল পরে ষাটের দশকে উৎপল দত্তকে কাছে পেয়েছিল। আমরা সে কথায় পরে আসছি।

তুলসীবাবু সাময়িক সুস্থ হয়ে কলকাতায় ফিরে গেলেন বটে, কিন্তু এরপর আর বেশিদিন জীবিত থাকেননি। যদ্দুর স্মরণে পড়ে, এরপর তিনি সত্যজিৎ রায়ের ‘জলসাঘর’ চলচ্চিত্রে একটা ছোট্ট চরিত্রে শেষ অভিনয় করেছিলেন। আজ সেদিনের ‘কথা ও কলম’এর খুব বেশি সদস্য বেঁচে নেই। তবুও যারা আছেন, তাঁদের কাছে তুলসী লাহিড়ির সান্নিধ্য এক উজ্জ্বল স্মৃতি। এই সময়ে সংস্থার কর্ণধার, নট ও পরিচালক মিহির দাসগুপ্তের পাশে এসে দাঁড়ালেন শহরের আর একজন প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব ও বাম রাজনীতির মানুষ সৌরেন বসু। শুরু হয়ে গেল পরবর্তী নাটকের মহড়া। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনি নিয়ে প্রতাপ চক্রবর্তীর নাটক ‘একতলা’। যাঁরা এই উপন্যাসটি পড়েছেন, তাঁদের জানা আছে যে, কলকাতা শহরের একটি মেসবাড়ির পটভূমিকায় লেখা তৎকালীন মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনগাথা হল এই উপন্যাসের নির্যাস। যেহেতু নাটকে নিচেরতলার মানুষের যাপনচিত্র তুলে ধরাই লক্ষ্য ছিল, তাই ‘কথা ও কলম’এর পরিচালকমণ্ডলীর নির্দেশ ও সহযোগিতায় প্রতাপ লিখলেন এই নাটক। মনে আছে, ছুটির দিনে নাট্যকারের বাড়িতে মিহির দাসগুপ্ত, সৌরেন বসু, অজিত চক্রবর্তী, বিজন চৌধুরীদের মত প্রবীণরা এসে নাটকের নির্মাণ নিয়ে আলোচনা করতেন এবং প্রতাপকে উপদেশ দিতেন। এমনকি, চারু মজুমদারের বৈঠকখানা ঘরে সন্ধ্যের পর মহড়া চলাকালীন, চারুবাবু নিজেও এসে বসতেন সেই ঘরের পাশের একটি বেঞ্চিতে লুঙ্গি আর শার্ট পরে, হাতে জ্বলন্ত বিড়ি। মন দিয়ে মহড়া দেখতে দেখতে ক্বচিৎ এক-আধটা মন্তব্য করে বসতেন, যেগুলো নিঃসন্দেহে ছিল মূল্যবান। কেননা চারু মজুমদার আগাগোড়াই ছিলেন একজন মার্কসবাদী। তাঁর হাতে তখন শিলিগুড়ি মহকুমার কমিউনিস্ট দলের সংগঠন গড়ে তোলার গুরুদায়িত্ব, তিনি মনেপ্রাণে চাইতেন, নাটক হোক সমাজের সর্বহারা শ্রেণির জীবনসংগ্রামের ছবি। মানুষের কথা বলুক নাটক। কেবল বিনোদনের জন্যে যে নাটক নয়, সেই কথাটাই বোঝাতেন চারু মজুমদার। আর সেই কারণেই ‘একতলা’ নাটকের অনেক সংলাপ ও দৃশ্য মূল কাহিনির থেকে সরে গিয়ে উপস্থাপিত করা হয়। এখানে নায়ক কনককে নিচের তলার এক লড়াকু যুবক হিসেবেই দেখানো হয়েছিল।

জানুয়ারিতে ‘লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার’ শেষ হতেই আর কালবিলম্ব করেনি সংস্থা। ফেব্রুয়ারির গোড়াতেই আরম্ভ হয়ে যায় ‘একতলা’র মহড়া। মজার বিষয় হল, এই সময়ে শহরের বেশ কিছু নাট্যানুরাগী এসে যোগ দিলেন ‘কথা ও কলম’ এ। সৌরেন বসুর কথা আগেই বলেছি। তিনিই চারুবাবুকে বলে তাঁর বাড়ির পুরনো কাঠের তৈরি বৈঠকখানা ঘরটি দলের মহড়া বা সভার জন্যে চেয়ে নিয়েছিলেন। আর এই সময়েই এসে নাটকের দলে যোগ দিলেন, কালী দত্ত, সুশীল ভট্টাচার্য, ধীরেন ভট্টাচার্য, সেবিকা ও গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুই বোন, অতুল দাস, সুনীল তরফদার, মণি সেন, অনাথ অধিকারীসহ বেশ কিছু শক্তিশালী অভিনেতা। এলেন গণসঙ্গীত শিল্পী শৈলেন বল ও তাঁর স্ত্রী মীরা বল, গায়ক আমিনুর রসিদ, আলোক সম্পাতে এলেন অনাদি দে এবং উমা রায়, মঞ্চ নির্মাণে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। যেন চাঁদের হাট! একটি নাটককে কতটা নিষ্ঠার সঙ্গে নির্মাণ করা সম্ভব, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ‘একতলা’। শিলিগুড়িতে তখন একটি নতুন মঞ্চ নির্মিত হয়েছে রেল কর্তৃপক্ষের তরফে। নাম জংশন ইনসটিট্যুট। শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে একটু দূরে হলেও সেখানে রেল কলোনির মানুষের ইচ্ছেয় ‘কথা ও কলম’ স্থির করে যে প্রথম রজনীর অভিনয় হবে সেখানেই। এ ব্যাপারে একটি কথা জানাতেই হয় যে, এই সংস্থার অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন

রেলে চাকরি করা। ফলে রেলের খরচেই এই নাটক উপস্থাপিত হয় ১৯৫৯ সালের মার্চের শেষে।

পর্দা উঠল বিজ্ঞাপিত সময় অনুসারে। প্রেক্ষাগৃহ ছোট হলেও পরিপূর্ণ। মহানন্দা নদীর অপর প্রান্তের একটি নবনির্মিত হলে নাটক। আশপাশের রেল কলোনির থেকে দর্শক এসেছেন আগ্রহ নিয়ে। পর্দা উঠতেই দেখা গেল মেসবাড়ির দৃশ্য। পেছন থেকে মৃদু আবহসঙ্গীতের সুর। দর্শকেরা বাক্যহীন। নাটক আরম্ভ হতেই তাঁদের প্রত্যাশা যেন মাত্রা পেল। সোয়া দু'ঘণ্টার পূর্ণাঙ্গ নাটক শেষ হল রাত ন'টার পর। পর্দা পড়তেই রেলের বড় সাহেব এসে মঞ্চের পেছনে তাঁর অভিবাদন জানিয়ে গেলেন কলাকুশলীদের ও সংগঠনকে। বললেন, সত্যিই উপভোগ করার মত নাটক। এতটা আশা তাঁরা করেননি নাকি! 'একতলা'র প্রথম রজনী সাফল্য পেলেও কিছু ভুলত্রুটি নজরে এসেছিল দলের কর্মকর্তাদের। যদিও অভিনয়ে সৌরেন বসু, প্রতাপ চক্রবর্তী, কালী দত্ত, সেবিকা ব্যানার্জি ও গীতা ব্যানার্জি, সুশীল ভট্টাচার্য ও দেবাশিস চক্রবর্তী সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন, তবু অন্যান্যরাও কিছুমাত্র উন ছিলেন না। আর মঞ্চসজ্জা, আলো ও আবহসঙ্গীত ছিল আশাতীত। শিলিগুড়ির মত একটি আধাশহরের নাট্যদলের এমন প্রয়াস সকলের কাছেই ছিল বিস্ময়ের। রেল কলোনির মানুষেরা আপ্লুত। নাটকের শেষে তাদের উল্লাস সেদিন ভরিয়ে দিয়েছিল দলের সমস্ত কলাকুশলী ও সদস্যদের হৃদয়। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবেনা একটা কথা বলা যে সেদিন সেই নাট্যমঞ্চ থেকে রাত দশটার পর বেরিয়ে একটা রিকশাও পাওয়া যায়নি শহরে আসবার জন্যে। নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবাই নিজেদের সাজসজ্জার জিনিস গুছিয়ে প্রায় আড়াই কিলোমিটার পথ হেঁটে ফিরেছিলেন বাড়িতে। তবে সাফল্যের আনন্দ সেই কষ্টকে বুঝতে দেয়নি। সখের থিয়েটার করা যে কী কঠিন কাজ ছিল সেইসময়ে, বিশেষ করে নাট্যদলের অনুশাসনে থেকে, তা প্রবীণ নাট্যকর্মীদের অজানা নেই। এখন তো সবাই অর্থের বিনিময়ে নাটক করে থাকেন। আজ থেকে ছয় দশক আগে শিলিগুড়ির মত ছোট্ট এক জনপদে নিজেদের পকেটের পয়সা খরচ করে দর্শকদের সামাজিক দিগদর্শনের কাজ যে কতটা কঠিন ছিল, তা সহজেই অনুমেয়।

এর দিনকতক পরেই 'একতলা' নাটকটি খানিকটা সংশোধনের পর স্থানীয় মিত্র সম্মিলনী মঞ্চে পুনরভিনীত হল। এবারে দর্শকদের মধ্যে বহু নাট্যরসিক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁদের মতে এটি এক অনবদ্য নাটক। আসলে বিষয়বস্তুটিকে মূল লেখকের পাশাপাশি কিছু সামাজিক দায়বদ্ধতার অনুষঙ্গ ঘটিয়ে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য করে তোলা হয়েছিল। সামাজিক মূল্যবোধকে শৈল্পিক ভাষায় পরিবর্তন করে, শ্লোগানকে দূরে সরিয়ে যে একটা বার্তা দেওয়া যায়, তার জলজ্যান্ত প্রমাণ ছিল 'একতলা'। এবং সেই কারণে শিলিগুড়ি শহরে 'কথা ও কলম'এর এগারো বছরের আয়ুষ্কালে সবচাইতে বেশি উপস্থাপিত হয়েছিল এই নাটক। নানা সময়ে 'একতলা' মঞ্চায়িত হয়েছে (মোট তেরোবার) এবং দর্শকদের মন ভরিয়ে দিয়েছে এটি। সময়ের সঙ্গে কলাকুশলী বদলে গেলেও নাটক কিন্তু একটুও গতিপথ হারায়নি। এখানেই 'কথা ও কলম'এর জিত।

ষাট সালেই 'কথা ও কলম' নেমে পড়ল তাদের নতুন প্রযোজনা নিয়ে। নাটক 'লোকটা'। প্রখ্যাত গল্পকারের কাহিনির নাট্যরূপ দিলেন সংগঠনের মূল সদস্য ও প্রথম মৌলিক নাট্যকার শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। মাত্র কয়েকটি চরিত্র নিয়ে এই নাটক। ঠিক দেড়মাসের ব্যবধানে এই নাটক মঞ্চস্থ করা হল সেই মিত্র সম্মিলনী প্রেক্ষাগৃহে মে মাসের শেষে। আসলে শিলিগুড়ির মানুষ

তখন নাটকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছেন। আর সৌজন্যে 'কথা ও কলম'এর নিষ্ঠা। তারা তো আর সৌখিন নাটক করত না, রীতিমত সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং দর্শকদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে সম্মান জানিয়েই প্রতিটি নাটক উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টা ছিল এই সংস্থার। 'লোকটা' উতরে গিয়েছিল সুনাম অনুযায়ী। তবে বলাবাহুল্য, যে এই নাটক সেইভাবে আগের প্রযোজনা 'একতলা'র মত সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়নি। হয়তো তড়িঘড়ি করে নাটক নামানো কিম্বা নাটকের নির্মাণ নিয়ে ভাবনাচিন্তায় কিছু খামতি থেকে গিয়েছিল। আর একথা তো মানতেই হবে, সব কাজ সবসময়ে মাস্টারপিস হতে পারেনা।

ইতিমধ্যে শিলিগুড়ি তথা উত্তরবাংলার একমাত্র নাট্যগোষ্ঠী 'কথা ও কলম'এর নাম পাশের শহর তো বটেই মহানগর কলকাতা শহরের মানুষও জেনে গিয়েছেন। সেই সূত্রেই বহিরাগত প্রচুর নাট্যোমোদী ও সংস্কৃতিকর্মী এই শহরে এসে 'কথা ও কলম'এর কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকেন। নিজেরা আগ্রহ দেখিয়ে যোগ দেন সংগঠনে। ফলে, রীতিমত চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ালো কর্মকর্তাদের যে কী উপায়ে এতজনকে কাজে লাগানো যায়! একটা নাটকে তো আর সবাইকে জায়গা দেওয়া সম্ভব নয়। আলোচনা হল। আবার অনেকে একথাও বললেন যে, সংস্থার তো তেমন কোনো তহবিল নেই যে বিশাল কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যায় যা সবাইকেও সন্তুষ্ট করতে পারে। আয় বলতে সামান্য কিছু সদস্য চাঁদা আর নামমাত্র নাটক দেখার দর্শনী। কিন্তু, অদম্য উৎসাহ আর কর্মক্ষমতার মানুষ, বিজন চৌধুরী, শৈলেন বল, প্রতাপ চক্রবর্তী ও আরো কয়েকজন রেল কর্মচারিদের প্রচেষ্টায় শেষপর্যন্ত স্থির হল, এবারে বড় চরিত্রলিপির পূর্ণাঙ্গ দুটি নাটকের প্রযোজনা করা হবে। এবং শুরু হল, নতুন নাটকের খোঁজ।

ইতিমধ্যে প্রখ্যাত লেখক জরাসন্ধর উপন্যাস নিয়ে নাটক রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল প্রতাপ চক্রবর্তীকে। কেননা শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দিন কয়েক আগেই বদলি হয়ে চলে গিয়েছিলেন কলকাতায়। নাটকের বিষয়বস্তু যেহেতু সমাজের ন্যায় অন্যায় এবং দেশের বিচারব্যবস্থার দোষত্রুটি, তাই সকলেরই অনুমোদন ছিল। প্রতাপ চক্রবর্তী খুব কম সময়ের মধ্যেই নাটক তৈরি করে ফেলেন 'অন্তরালে' এবং পরিচালনা গোষ্ঠীর মনোমত হয় তা। কিন্তু একটি নাটকে তো আর সমস্ত কলাকুশলীর স্থান সঙ্কুলান সম্ভব নয় তাই দ্বিতীয় একটি নাটকের প্রসঙ্গ ওঠে। কেননা, একসঙ্গে দুটো নাটকের মহড়া পৃথক অভিনেতাদের নিয়ে করলে অনেকটাই সমস্যার সুরাহা সম্ভব। ঠিক হল, যেহেতু হাতের কাছে কোনো পাণ্ডুলিপি নাটক নেই, তাই এবারে কোনো একটি ভালো মুদ্রিত নাটক ধরা যাক। নাটক বাছা হল কিরণ মৈত্রের মঞ্চসফল নাটক 'বুব্দুদ'। বুদ্বুদের বিষয় হয়তো প্রবীণ নাট্যোমোদীদের অজানা নয়। তবুও নবীনদের অবগতির জন্যে জানাই যে, বাঙালি সমাজের পরিবারের মধ্যে সন্তান নিয়ে যে সুখ দুঃখ, তারই জীবন্ত একটি চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল এই নাটকে, সময়ে সঙ্গে তাল রেখে। কলকাতার মঞ্চে 'বুদ্বুদ' ব্যাপক সাফল্য পেয়েছিল। আর 'কথা ও কলম'এর এটিই ছিল প্রথম কোনো মুদ্রিত পূর্ব মঞ্চায়িত নাটক।

'অন্তরালে' নাটকে মূল চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন কালী দত্ত, ধীরেন কর এবং বিপ্লব বসু। ধীরেন কর ও বিপ্লব বসু এই প্রথম এই সংস্থায় যোগ দিলেন এবং বলাবাহুল্য যে দুজনেই তাঁদের অভিনয় দক্ষতা প্রমাণ করতে পেরেছিলেন। জেলখানার পটভূমিকাতে এই নাটক অভিনয়, মঞ্চ সজ্জা, আবহ এবং রূপসজ্জাতে প্রকৃতই উত্তীর্ণ হতে পেরেছিল দর্শকবৃন্দের বিচারে। সাফল্য

আসাতে এই নাটকটি কয়েকদিন পর পুনর্বার উপস্থাপিত হয়।

ওদিকে কিরণ মৈত্রের মুদ্রিত ও বহু প্রশংসিত নাটক 'বুদ্বুদ' তৈরি হয়ে যায়। এখানেও বেশ কিছু নতুন অভিনেতা যোগ দিয়ে প্রথমবারের জন্যে 'কথা ও কলম'এর জন্যে মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন। পীযূষ ঘটক তাদের মধ্যে অন্যতম। ছোটো ছোটো ভিন্নধর্মী কিছু চরিত্রের সমাবেশে এই নাটকটি বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের জলছবি হয়ে উঠেছিল অভিনয় গুণে এবং মঞ্চসজ্জা ও আবহে। উপরন্তু ছিল পরিচালকের মুন্সিয়ানা। এক কথায়, 'বুদ্বুদ' সফল প্রযোজনা। তবে সবার অভিনয়ের মধ্যে প্রবীণ অভিনেতা অজিত চক্রবর্তীর উপস্থিতি ছিল অসাধারণ। বলা উচিত, তিনিই গোটা নাটকটিকে একার চেষ্টায় সাফল্যের শিখরে ওঠাতে পেরেছিলেন। সেই কারণে এই নাটকটিও অল্পদিনের মধ্যেই আর এক রাতে মঞ্চস্থ করা হয় দর্শককূলের আগ্রহে।

শিলিগুড়িতে ষাটের দশকে মঞ্চ ছিল না তেমন। পশ্চিমপ্রান্তে আর্যসমিতি, পুবে সুভাষপল্লি নাট্যমঞ্চ আর সদ্য গড়ে ওঠা জংশন ইন্সটিট্যুট, রেলের তরফে মহানন্দা নদীর ওপারে। এগুলো সেই অর্থে নামেই নাট্যমঞ্চ। সুভাষপল্লীতে তো প্রেক্ষাগৃহও ছিলনা। আর মিত্র সম্মিলনী তো সেই বিশ শতকের প্রথমার্ধেই সবেধন নীলমণি হয়ে এই জনপদের সংস্কৃতির হাল ধরেছিল। ফলে, নাটক সঙ্গীত ও ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্যে এই প্রেক্ষাগৃহ ছিল এখানকার মানুষের একমাত্র বিনোদনের কেন্দ্র। মাঝেমধ্যেই তখন অনুষ্ঠান লেগে থাকত। তাই সুবিধেমত দিন পাওয়া যেতনা চট করে। কাজেই সমস্যা ছিল প্রকট। উপরন্তু, আলোকসজ্জা বা মঞ্চসজ্জার জন্যে তেমন সুবিধে ছিলনা। পেছনে আঁকা সিন দিয়েই কাজ চালাতেন এখানকার সখের নাটকের ক্লাব বা সমিতিরা। বিজলি এসেছে অনেকটা পর। তবে ফুট লাইট আর ফ্লাড লাইটেই অভিনয় করা ছিল রেওয়াজ। 'কথা ও কলম' তৈরি হবার পর মঞ্চ নিয়ে ভাবনাচিন্তার পাশাপাশি আলোকে বিশেষভাবে কলকাতার নাট্যমঞ্চের অনুকরণে করবার প্রয়াস আরম্ভ হয়। এ ব্যাপারে শৈলেন বল, অনাদি দে, গোপাল দাস, মণি সেন প্রমুখরা যথেষ্ট পরিশ্রম করেই প্রথম নাটক 'ভাগশেষ' থেকে ষাটের দশকের প্রথম দু'বছর দর্শককুলকে এই সংগঠন বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে, তারা আর সব সখের নাটকের দল নয়। নাট্য আন্দোলনের প্রতি দায়বদ্ধ এই 'কথা ও কলম'। আর আবহসঙ্গীত যে কতটা কার্যকরী হতে পারে, তাও দেখাতে পেরেছিল তারা। অবশ্য এসবের পেছনে ছিল গঙ্গার ওপারে কিছু চাকরি করতে আসা কলকাতার সাংস্কৃতিক মানুষ ও তাদের যোগদান। সেইসময়ে, অর্থাৎ পাঁচের দশকের শেষদিকে কলকাতা ছিল প্রকৃতই একটি দূরবর্তী স্থান, বিশেষ করে, দেশভাগের পর। তখন শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা যেতে প্রায় বাইশ ঘণ্টা লেগে যেত ট্রেনে, মিটারগেজ লাইনে। আর সংবাদপত্র বা আকাশবাণীর খবর? তাও ছিল অনেকটাই অধরা। আগের দিনের সংবাদপত্র আসত পরেরদিন বিকেলে। রেডিও সংবাদ আবহাওয়া ভালো থাকলে যদি বা শোনা যেত, মন্দ আবহাওয়াতে সে সম্পূর্ণ অধরা। কাজেই উত্তরবাংলার মানুষজন যে বাংলার সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে 'ব্যাকবেঞ্চার' তা বলাইবাহুল্য। এই পরিস্থিতিতে এখানে, একটি উদ্বাস্তু অধ্যুষিত আধা শহরে নাট্য আন্দোলনের ভাবনাচিন্তা অনেকের কাছেই মনে হয়েছিল, 'ছেঁড়া কাথায় শুয়ে রাজকন্যার স্বপ্ন দেখা'।

যাক সেসব কথা। আসি 'কথা ও কলম'এর পরের পদক্ষেপ। ষাটের শেষের দিকেই বেশ তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছিল রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের ব্যাপারে সমস্ত বিশ্বব্যাপী।

ভারত তো বটেই, বাংলার গ্রামগঞ্জেও একটা অভূতপূর্ব আলোড়ন লক্ষ্য করা গেল বছরখানেক আগে থাকতেই। সরকারি বেসরকারি উদ্যোগের শেষ নেই। শিলিগুড়িতেও সরকারি ও পুরসভার তরফে একষট্টি সালের মে মাস থেকে যাতে সুষ্ঠুভাবে বিশ্ববন্দিত কবির জন্মশতবর্ষ পালন করা যায়, তা জন্যে শহরের সমস্ত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকেই আমন্ত্রণলিপি পাঠানো হয়। এদের মধ্যে 'কথা ও কলম' ছিল অন্যতম। কাজেই, সংগঠনের পক্ষ থেকে সভা করে স্থির করা হল, কী নাটক নিয়ে তার উপস্থিত হবে! কেননা, স্থানীয় বাঘাযতীন পার্কে এই বিশাল আয়োজনের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হবে একটি বড় মঞ্চ, যা কিনা নাটক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উপযোগী হয়। কলকাতাসহ বাংলা ও দেশের নানান প্রান্ত থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যে অনুরোধ জানানো হয়েছে তথ্য ও সংস্কৃতি এবং শিলিগুড়ি পুরসভার তরফে।

দলের অন্যতম কর্ণধার মিহির দাসগুপ্ত, বিজন চৌধুরী, অজিত চক্রবর্তী, সৌরেন বসু এবং প্রতাপ চক্রবর্তীরা মিলিত হয়ে এক আলোচনার মধ্যে স্থির করলেন, রবি ঠাকুরের জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য হবে 'কথা ও কলম'এর কবি রচিত নাটক 'রক্তকরবী'। এ নিয়ে কিছুটা দ্বিধা যে ছিলনা উদ্যোক্তাদের মধ্যে তা নয়। দ্বিধার কারণ হল, 'রক্তকরবী' বেশ কঠিন নাটক এবং শম্ভু মিত্র এই নাটকটি কলকাতার মঞ্চে উপস্থাপনা করে এতটাই খ্যাতি অর্জন করেছেন, যে তাঁর পর শিলিগুড়ির মত একটি নতুন নাট্যদলের পক্ষে সেটি উৎরে দেওয়া কতটা সম্ভব হবে? দুনম্বর ছিল, সেট তৈরি ও অভিনয়ের উৎকর্ষ নিয়ে। পাশাপাশি রূপসজ্জা, আবহ এবং আলোকসম্পাতের বিষয়। কাজেই, নাটকের মহড়া আরম্ভ হবার আগে আবার আলোচনা পরামর্শ চলল নিজেদের মধ্যে। অভিজ্ঞ মিহির দাসগুপ্ত, শৈলেন বল, বিজয় চৌধুরী, প্রতাপ চক্রবর্তী, অনাদি দাস, মণি সেন বা সৌরেন বসু মিলে অনেকটা 'যো হোগা দেখা যায়গা' গোছের মন্তব্য করে নেমে পড়লেন কোমর বেঁধে। মিহির দাসগুপ্ত ও সৌরেন বসু দুজনকেই পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হল। তাঁরা কলাকুশলীদের বাছলেন চরিত্র অনুসারে। ষাটের পুজোর পরেই নিয়ম করে শুরু হয়ে গেল মহড়া। বিশাল চরিত্রলিপি সামাল দেওয়া কঠিন কাজ। তাই একেকদিন একেক অংশ নিয়ে চারু মজুমদারের সেই কাঠের বৈঠকখানা ঘরেই চলল মহড়া প্রতিদিন সন্ধ্যের পর। ওদিকে মঞ্চসজ্জা, আলোকসজ্জা, আবহসঙ্গীত ইত্যাদি নিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যেরা সোজা কয়েকজন মিলে কলকাতা রওনা হয়ে গেলেন ন্যু এম্পায়ার থিয়েটারে শম্ভু মিত্রের এই প্রযোজনা দেখতে এবং তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মূল্যবান পরামর্শ নিতে। শ্রদ্ধেয় শম্ভু মিত্র সহযোগিতা করতে কার্পণ্য করেননি। এমনকি তাদের নিজের তরফে আগাম অভিনন্দন জানিয়ে রেখেছিলেন সাফল্যের।

একটি ভালো নাটকের নির্মাণে যে কত রক্ত জল করে, কত মাথা খাটিয়ে করতে হয়, তা দেখা গিয়েছিল এই প্রযোজনার সময়ে। প্রায় সাত আট মাস কঠোর পরিশ্রমে 'রক্তকরবী' তৈরি হল। ইতিমধ্যে মে মাসের আট তারিখেই আরম্ভ হয়ে গেল শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কে নবনির্মিত মঞ্চে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান। একমাস যাবৎ এই অনুষ্ঠানের জন্যে পুরো পার্কের মাঠটিকেই ঘিরে ফেলা হয়েছিল। মাথার ওপর সামিয়ানা ও ত্রিপল খাটিয়ে দর্শকদের আসন পাতা হয়েছিল। প্রায় পাঁচহাজার দর্শক স্বচ্ছন্দে যাতে আসন গ্রহণ করতে পারেন, তা বন্দোবস্ত হয়। শিলিগুড়ির মানুষের মধ্যে এক অপূর্ব উন্মাদনা! কেননা, ইতিপূর্বে এই জনপদের মানুষ কখনো এতবড় কর্মকাণ্ড দেখেননি। তার ওপরে কলকাতা, উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ সহ দেশের আরো অনেক স্থানের

নামী শিল্পী, সাংস্কৃতিক দল ও নাট্যদল এই দীর্ঘ সময় ধরে অনুষ্ঠান আলো করে রাখবেন!

'কথা ও কলম'এর নাটক ছিল সম্ভবত ১৩ মে ১৯৬১। ইতিমধ্যেই ৮ তারিখ থেকে স্থানীয় নবারুণ সঙ্ঘের ও অন্য একটি দলের দুটো নাটক এবং শিলিগুড়ি ও কলকাতার নৃত্যশিল্পীদের দুটো নৃত্যনাট্যে আর সঙ্গীত শিল্পীদের গানের অনুষ্ঠানের পাশাপাশি কয়েকজন বিদগ্ধ রবীন্দ্র সমালোচক বা গবেষকদের আলোচনা অনুষ্ঠান হয়েছে। দর্শকাসন প্রায় প্রতিদিনই পূর্ণ থাকে। ১৩ মে রাতে 'রক্তকরবী' হবে জেনে শুরুর আগেই বাঘাযতীন পার্কের দর্শকাসন পরিপূর্ণ। এমনকি, সেখানে আগত বহু কলকাতার শিল্পী এবং কলকাতার শৌভনিক দলের নাট্য কুলাকুশলীদের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা গেল। শৌভনিকের নাটক ছিল পরের সন্ধ্যেয়। 'গোরা'। ঠিক সাতটায় শুরু হল 'রক্তকরবী'। বিশাল সেট। একেবারে কলকাতার অনুকরণে। অনেকেই চমকে গিয়েছিলেন। নাটক শুরু থেকে শেষপর্যন্ত যেন এক স্বপ্নের আবেশ ভরে দিল দর্শকবৃন্দকে। কী নাট্যগোষ্ঠীর পরিচালক ও কয়েকজন মঞ্চের পেছনে এসে তাঁদের মুগ্ধতার কথা বলতে দ্বিধা করলেন না। বললেন, কলকাতার বাইরে, একটি মফস্বল শহরে এমন প্রযোজনা ভাবতেই পারা যায়না।

সেই রাতে 'কথা ও কলম' রীতিমত পেশাদার নাট্যগোষ্ঠীর মত উপস্থাপিত করেছিল তাদের নাটক 'রক্তকরবী'। এর পেছনে ছিল এক সার্বিক প্রচেষ্টা এবং ভালোবাসা। প্রায় আট মাসের ওপরে পরিশ্রম করে এমন একটি প্রযোজনা সম্ভব। মিহির দাসগুপ্ত ও সৌরেন বসু পরিচালনার পাশাপাশি শৈলেন বল, আমিনুর রশিদ (আবহ), অনাদি দে ও উমা রায় (আলো) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (মঞ্চসজ্জা) বুজু তরফদার (রূপসজ্জা)। আর অভিনয়ে যাদের নামোল্লেখ না করলেই নয়, তাঁরা হলেন, সেবিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (নন্দিনী), মিহির দাসগুপ্ত (রাজা), প্রতাপ চক্রবর্তী (অধ্যাপক), সৌরেন বসু (বিশু পাগলা), সাবিত্রী রায় (চন্দ্রা), কালী দত্ত (সর্দার) প্রবোধ পোদ্দার (গোঁসাই), সত্যেশ ঘোষ (ফাগুলাল) এবং গোবিন্দ চক্রবর্তী।

একষট্টির এই নাটকের সঙ্গে সঙ্গেই বলা উচিত 'কথা ও কলম' যেন একলাফে অনেক কয়েক ধাপ এগিয়ে গেল। সমস্ত উত্তরবঙ্গ তো বটেই কলকাতার নাটক নিয়ে যারা নিয়মিত পরিচর্যা করেন, তাঁরাও জেনে গেলেন 'কথা ও কলম' বলে একটি নাট্যগোষ্ঠী রয়েছে শিলিগুড়ি শহরে। এই নাটক নিবেদনের আগে সংগঠনের তরফে একটি লিফলেট বিলি করা হয় চরিত্রলিপি এবং কিছু কথা দিয়ে। তাতে নিবেদনে বলা হয়েছিল, 'আধুনিক যুগের বিচারে 'রক্তকরবী' রবীন্দ্র রচিত নাটকগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ধনতান্ত্রিক সমাজের কৃষি-সভ্যতার সাথে যন্ত্র-সভ্যতার যে অনস্বীকার্য বিরোধ সেইটিই 'রক্তকরবী' নাটকে বাণীরূপ, তথা নাট্যরূপ লাভ করেছে।'

(চলবে)

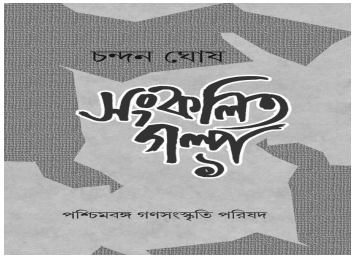

প্রকাশিত হয়েছে

চন্দন ঘোষ-এর

সংকলিত গল্প ১

দাম : ২০০ টাকা

নির্মল নাগ

নিবেদিতা : জাতীয়তা ও বৈপ্লবিক সম্পর্ক (১০)

(২৪)

মজফরপুরের বোমা বিস্ফোরণ থেকে ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে বোমার আবির্ভাব— একথা বলা হয়ে থাকে। তিলক বোমার তাৎপর্য বুঝেছিলেন, যদিও এই ব্যাপারে লেখালিখির জন্য কয়েকটি সংবাদপত্র স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে, সম্পাদককে শাস্তি পেতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও অকুতোভয় তিলক ক্ষুদিরাম ও বোমার সমর্থনে 'কেশরী'তে পরপর পাঁচটি সাহসী প্রবন্ধ লিখলেন। তাঁর প্রথম প্রবন্ধে ('The country's misfortune', Kesari, 12 May 1908) বললেন, 'সবাই জানে, ব্রিটিশরাজ কতখানি শক্তিশালী। কিন্তু লাগামছাড়া ক্ষমতা ব্যবহারকারী শাসকদের এও জানা উচিত, মানুষের ধৈর্যের একটা সীমা আছে। আমলাতন্ত্রকে আত্মশোধন করতেই হবে। যদি সে কর্তব্যে অবহেলা হয়, মজফরপুর ধরনের দুর্বিপাক অবশ্যম্ভাবী। ...ঐ ঘটনা (মজফরপুরের) নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্যজনক, তবে এও আমরা মনে করি যতদিন এজাতীয় ঘটনার পিছনের কারণগুলি বিদ্যমান থাকবে, তাদের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনাও লোপ পাবে না। ...এই নতুন উপস (ups) বৃক্ষটিকে নির্মূল করতে আগে দরকার শাসনতান্ত্রিক সংস্কার।'[১৪০] সেদিন একাধিক ইংরেজ রাজনীতিক অনুরূপ মত প্রকাশ করেন। William Wedderburn বলেন যে, ইংরেজ শাসকদের এখন বোঝা উচিত যে, সরকারি অত্যাচারের ফলেই রাশিয়ার মতো ভারতেও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড শুরু হয়েছে। ভারতবন্ধু Keir Hardy বললেন, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সরকারের বর্তমান নীতির ফলশ্রুতি। এমনকি, লন্ডনের 'টাইমস' লিখল— নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন বাঞ্ছিত ফল না দিলে বোমা এবং বুলেটের সাহায্য গ্রহণ ভিন্ন জনসাধারণের অন্য কোনো পথ নেই। কিন্তু অধিকাংশ সাহেবি-কাগজগুলোর অবশ্য অভিযোগ, ভারতীয় নেতাদের উগ্র বক্তৃতা ও লেখার জন্য মজফরপুরের মতো বোমা-কাণ্ড ঘটেছে (এলাহাবাদের 'পাইওনিয়ার' বলেছিল— প্রতিটি বোমার ঘটনার জন্য সন্দেহভাজন পঁচিশটি নেতাকে ফাঁসিতে লটকানো উচিত।[১৪১]) তিলক বললেন, 'বোমার প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করতে হলে তিনটি বিষয় স্থিরভাবে বিবেচনা করা দরকার— ভারতবর্ষের বোমা ব্যবহারকারীদের আবির্ভাব হল কী কারণে? এদেশে সে-দলের অবস্থা কী হবে? এবং এই দল সরকার ও দেশের উপর কী প্রভাব বিস্তার করবে? ...শাসক-সম্প্রদায় যে অত্যাচার করে, দেশবাসীকে যেরকম উত্যক্ত করে এবং যেভাবে জনমতকে উপেক্ষা করে চলে তারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এই দলের আবির্ভাব হয়েছে। কাজেই এর জন্য রাজনৈতিক বক্তৃতা, আলোচনা ও রচনাকে দায়ী করা চলে না— কর্মচারিদের হঠকারিতা ও একগুঁয়েমিই এজন্য দায়ী। দায়ী হল স্বৈরাচারী, দায়িত্বহীন, অনিয়মিত ক্ষমতার অধিকারী শ্বেত আমলাতন্ত্র। তারা দিন-দিন জনগণের কাছে অসহ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তিলক তাঁর চতুর্থ প্রবন্ধে (These remedies are not lasting, Kesari, 9 June 1908) বললেন, 'বাংলার বোমার পিছনে রয়েছে দেশপ্রেমের প্রাবল্য। বাঙালিরা নৈরাজ্যবাদী নয়। নৈরাজ্যবাদীদের অস্ত্র ব্যবহার করেছে মাত্র। ...বোমা না ফাটালে সরকার বুঝতেই

পারত না তার স্বৈরাচার জনগণকে কতখানি অস্থির করেছে। ...যাই হোক, বোমা জনসাধারণের হাতে একটা ভয়াবহ অস্ত্র হয়ে উঠছে, সরকারের সামরিক শক্তিকেও তারা আর তেমন ভয় করবে না। স্বরাজের মৌলিক অধিকারগুলি দেশবাসীর হাতে তুলে দেওয়াই ভারতবর্ষে বোমাতঙ্ক থেকে মুক্তি পাবার কেমাত্র পথ।'[১৪২]

বিপ্লবীদের বিক্ষিপ্ত হিংসাত্মক ঘটনা কিন্তু ভারতসচিব মর্লিকে (যাঁকে উদারনৈতিক বলা হয়েছিল) তেমন ক্ষুব্ধ করে তোলেনি। নির্বিচার দমননীতি তিনি পছন্দ করেননি। কিংসফোর্ডের আদেশে সুশীল সেনকে বেত্রাঘাতের ঘটনাকে তাঁর নিন্দা করতেও বাধেনি। এদিকে ১৯০৮-এর মে নাগাদ মানিকতলার বিপ্লবীদের আখড়া ও অস্ত্রাগার আবিষ্কার এবং সমগ্র ভারতবর্ষে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা সম্পর্কে সমগ্র কাগজপত্র পুলিশের হাতে আসায় সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে মিন্টোর মনোভাব কঠোর করে তোলে। পুলিশের গোয়েন্দাবিভাগ কিন্তু ঠিক-ঠিক সংবাদ সরবরাহ করতে পারেনি। মিন্টো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং সর্বশক্তি দিয়ে আসন্ন বিদ্রোহ দমনে প্রস্তুত হয়ে যান। তিলককে শায়েস্তা করার সুযোগ সরকার অনেকদিন ধরেই খুঁজছিল, এবার তাঁকে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেল। 'কেশরী'তে ১২ মে এবং ৯ জুন ১৯০৮-এ প্রকাশিত রচনার জন্য মিন্টো তিলকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা (গ্রেপ্তার, সবেমাত্র ৮ জুন সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ আইন বলবৎ হয়েছে) নিতে উদ্যত হলেন। ইতিমধ্যে রাজদ্রোহের অভিযোগে বোম্বাই-র 'স্বরাজ্য', 'বিহারী' ও 'অরুণোদয়' পত্রিকার সম্পাদকেরা বন্দি হয়েছেন। ১১ জুন 'কাল'-এর সম্পাদক পরাঞ্জপেকেও গ্রেপ্তার করা হয়। মিন্টোর এই উদ্যোগ যদিও মর্লিকে অসন্তুষ্ট করেছিল, তবুও মিন্টো থামবার পাত্র নন। লিখলেন যে, তিলকের মতো উগ্র রাজনৈতিক নেতার প্রতি সদাশয়তা দেখানোর সময় এটা নয়। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা সই হল ২৩ জুন ১৯০৮, তিলককে ধরানো হল পরদিন সন্ধ্যায়, যাতে তিনি জামিনে খালাস চাইতে না পারেন। ২৫ জুন তিলকের বাসভবন, 'কেশরী' ও 'মারাঠা' পত্রিকার অফিস ইত্যাদি তল্লাশি করা হল প্রমাণ সংগ্রহের অছিলায়, যাদের তুচ্ছতা পরে প্রমাণিত হয়েছিল। বোম্বাই-এর চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মি. অ্যাস্টন মামলাটি হাইকোর্টে পাঠালেন। হাইকোর্টের জজ মি. দাভারের আদালতে ১৩ জুলাই শুনানির দিন স্থির হল। স্পেশাল জুরি (৭জন ইওরোপীয় ও ২ জন ভারতীয়) নিয়োগ করা হল তাঁদের যাঁরা মারাঠি ভাষা না জেনেই মারাঠি প্রবন্ধের বিচার করবেন। প্রবন্ধগুলির ইংরেজি অনুবাদে অনেক ইচ্ছাকৃত বিকৃতি ছিল (অনুবাদক বি.ডি. যোশী তাঁর সাক্ষ্যে অনুবাদ যথাযথ হয়েছে বললেও পরে স্বীকার করেন অনুবাদে ভুল ছিল)। তিলকের বিরুদ্ধে এইসব তড়িঘড়ি ব্যবস্থা গ্রহণে মিন্টোর তৎপরতা মর্লিকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁর সঠিক অনুবাদ ছিল, এটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তাঁর ধারণা অভ্রান্ত ছিল— 'এটা স্বাভাবিক যে, ওঁরা তিলককে দোষী সাব্যস্ত করতে পারবেন, কেননা জুরি নির্বাচন ঐ উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে।' তিলকের শাস্তি যে লঘু হবে না তাও মর্লির অজানা ছিল না।[১৪৩]

তিলক স্থির করলেন, আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন। যদিও প্রখ্যাত ব্যারিস্টার জিন্না সাহেবের ডিফেন্ড করার কথা ছিল কিন্তু তিলকের মনোমত সমর্থন তিনি করতে পারেননি। দীর্ঘ সময় ধরে (১৫-২২ জুলাই) তিলক নিজের সওয়াল করে বললেন, 'আমি আপনাদের কাছে দয়া ভিক্ষা করতে আসিনি। আমি আমার ফলাফলের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আমি পাগল নই, আমি ওগুলো লিখেছি কারণ জনস্বার্থে তা লেখা কর্তব্যবোধ করেছি'। এবার অ্যাডভোকেট জেনারেল জুরিদের

উল্লেখ দীর্ঘ চারঘণ্টা ধরে বোঝাতে চাইলেন— 'তিলক নিঃসন্দেহে অপরাধী।' রাত্রি আটটার সময়ে জুরিরা ভিতরে চলে গেলেন (নিয়মমতো, এটা পরের দিন করা যেতে পারত, কিন্তু বিচারপতি দাভারের অতো সময় ছিল না)। তিলক কয়েকজন বন্ধু খাপাদে, কেলকার প্রমুখের সঙ্গে একটু চা-পান করলেন। জুরিরা রাত ৯.২০ মিনিটে ফিরে তিলককে দোষী ঘোষণা করলেন (৭-১ ভোটে)। বিচারক তিলককে জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু বলার আছে কিনা। তিলক দৃঢ়ভাবে জানালেন, 'আমি বলতে চাই, জুরিদের বিপরীত সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও, আমি নির্দোষ। আমি যে আদর্শের পক্ষে দাঁড়িয়েছি তা আমার মুক্ত জীবনের চেয়ে আমার যন্ত্রণাময় জীবনের দ্বারা অধিকতর শক্তিশালী হবে।' ২২ জুলাই বিচারপতি দাভার সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা, নিন্দা ও বিদ্বেষ ছড়ায় এমন দুটি উত্তেজক প্রবন্ধ লেখার অপরাধে (১২৪-এ আই.পি.সি. ধারায়) তিলককে ছ'বছর মান্দালয় জেলে রুদ্ধ থাকার দণ্ড দিলেন এবং সঙ্গে এক হাজার টাকার জরিমানাও ধার্য করলেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না, এই ধরনের জো-হুজুর বিচারকের সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা প্রতিশোধ তুলতেই চেয়েছিলেন। বাংলার বোমা-বারুদের প্রতি সহানুভূতিসূচক রচনা প্রকাশের জন্যই এই শাস্তিবিধান। ব্রিটিশ শাসন এইভাবে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে 'লোকমান্য' তিলকের পরিণত কর্মজীবনের দীর্ঘ ছ'টি বছরকে হরণ করে নিয়েছিল। তাঁর তুল্য শান্তি ঐ সময়ে আর কোনো চরমপন্থী নেতাকে পেতে হয়নি।[১৪৪] তিলককে জনজীবন থেকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে মডারেটদের কী ভূমিকা ছিল, তাঁদের গোপন উস্কানি ছিল কিনা, এবিষয়ে বিতর্ক আছে। আপাতত এ থেকে বিরত থাকছি।

১৯০৮-এ তিলকের মামলা যখন চলছিল নিবেদিতা তখন বিলেতে। হয়তো সেকারণে, তিলকের প্রকাশ্য বিচার সম্পর্কে তাঁর বলার কিছু ছিল না। অথচ, নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবন বর্ণনায় তিলক-প্রসঙ্গ বাদ-থাকা অসম্ভব মনে হয়। ১৯০২-এ ভারত ভ্রমণ কালে তিলকের সঙ্গে তাঁর পরিচয়, বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতার বিষয় তিলকের কাগজে প্রকাশ ইত্যাদিতে বুঝতে অসুবিধা হয়না যে রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনায় তিলকের সঙ্গে তাঁর ঐক্যই ছিল। ১৯০৬-এ কলকাতা কংগ্রেসের সময় (অসুস্থতার কারণে নিবেদিতা যোগ দেননি) তিলকের সঙ্গে তাঁর ভাব-বিনিময় অসম্ভব নয়। আশ্চর্য যে, নিবেদিতার চিঠি-পত্রে তিলক-প্রসঙ্গ খুবই কম দেখা যায়। হতে পারে, চিঠিপত্রে নিবেদিতা 'বিপজ্জনক' রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বিষয়ে সচেতনভাবেই এড়িয়ে গেছেন (অরবিন্দের নামও একারণে হয়তো তিনি চিঠিতে বেশি উল্লেখ করেননি)। তিলককে কোনো ছদ্মনামে চিহ্নিত করে লেখালিখি করেছিলেন কিনা, তা আমাদের অজানা।[১৪৫] (চলবে)

সূত্রাবলি :

১৪০. অমলেশ ত্রিপাঠী— ভারতের মুক্তিসংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব, আনন্দ পাব.প্রা.লি., ২০০৩, পৃ. ২১১
১৪১. শঙ্করীপ্রসাদ বসু— নিবেদিতা লোকমাতা, ২য় খণ্ড, আনন্দ পাব. প্রা.লি., ১৪১৪, পৃ. ২২৩
১৪২. সূত্র ১৪০, পৃ. ২১২
১৪৩. সূত্র ১৪০, পৃ. ১৮৮
১৪৪. জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়— স্বাধীনতা আন্দোলন : কিছু কথা-কিছু কাহিনী, ভাস্বতী, ২০০৯, পৃ. ১৬৭-২৮৩
১৪৫. সূত্র ১৪১, পৃ. ২২৮

রণধীরকুমার দে

পুরানো সেই বীরের কথা

বাঙালি কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিয়ে চায়?' স্বাধীনতার জন্য এই আকুতি খ্রিস্টপূর্বযুগে মহাবীর পুরুর সময় থেকে চিতোরের রাণা প্রতাপ সিংহ, মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি শিবাজি ও তারও পরে অনেক অনেক বীরপুরুষ আমাদের প্রাণে জাগিয়ে চলেছেন। আর এই আকুতিরই ফল হল ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ যাকে ইংরেজ রাজত্বের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রথম অভ্যুত্থান বললে কিছু ভুল বলা হবে না। পরবর্তী সময়ে এই আকুতি নিয়েই গড়ে উঠেছিল আমাদের এই বাংলায় নানা গুপ্তসমিতি বিদেশি কুশাসনের প্রতিবাদে। অমর হয়ে রয়েছেন শহিদ ক্ষুদিরাম ও বাংলা মায়ের অন্যান্য অসংখ্য বিপ্লবী সন্তান। নির্মলকুমার নাগের লেখা 'ফড়কে তিলক চাপেকর ভাইয়েরা' নামের ছোট বইটিতে পাচ্ছি মহারাষ্ট্রের পুনা শহরের কয়েকজন বীর শহিদদের মনের এই আকুতির কথা।

সিপাহি বিদ্রোহের পর কোম্পানির শাসনের অবসান হলেও মহারানির শাসনকালে ইংরেজ কু-শাসনের অবসান তো হলই না বরং বিচিত্ররূপে তা বেড়েই চলল। বিজ্ঞান বলে যে, প্রতিটি ক্রিয়ার একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে। সেই একই নিয়মের প্রভাব কিন্তু অন্যত্রও সত্য। অত্যাচার যেখানে যতটা বাড়বে প্রতিরোধ সেখানে ততটাই গড়ে উঠবে। তা কোথাও সম্মুখ প্রতিবাদে কোথাও বা গেরিলা কায়দায়। পুনার বাসুদেব রাও বলবন্ত ফড়কে বা দ্বিতীয় শিবাজি সম্পর্কে বিশেষ জানা ছিল না। তাঁর প্রতিবাদী চরিত্রটি লেখক এখানে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষকে মিশনারিরা খাদ্যের লোভ দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করছে, অনাহারে ও মহামারিতে অসংখ্য লোক মারা যাচ্ছে এবং তা দেখেও ইংরেজ শাসকের অব্যবস্থা ও চরম ঔদাসীন্য বলবন্ত ফড়কে যিনি ইংরেজ সরকারেরই একজন আধিকারিক ছিলেন তাঁকে বিপ্লবী করে তুলল। তাঁর সেই সর্বাত্মক প্রতিবাদের রূপটিই এখানে লেখক তুলে ধরেছেন। লেখক দেখিয়েছেন যে বাংলার আগেই ফড়কে পুনায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদেশি দ্রব্য বর্জনের মত অর্থনৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন (পৃ. ২২)। বাংলার অনুশীলন বা যুগান্তর দলের মতই ডাকাতি করে অর্থসংগ্রহ করে তিনি অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর প্রতিবাদের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, ইংরেজরা তাঁকে আয়র্লন্ডের বিপ্লবীদের সমগোত্রীয় বলে মান্যতা দিতে বাধ্য হয়েছিল। যদিও তিনি তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেননি, তবু ভারতীয় বিপ্লবের রূপরেখা যে তিনি এঁকে দিয়েছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পরবর্তীকালে কংগ্রেসকে যে চরমপন্থা নিতে হবে তা যেন স্পষ্ট হয়ে গেল, যদিও তা ছিল সময়ের অপেক্ষা। পরাক্রান্ত ইংরেজ শাসনের সঙ্গে অসম এই লড়াইয়ে ফড়কের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হলেও ডাকাতির মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইয়েমেনের এডেন শহরে দ্বীপান্তর দেওয়া হয় এবং সেখানে তিনি অকথ্য অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে ক্ষয়রোগে মৃত্যুবরণ করেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাল গঙ্গাধর তিলক এক বিশিষ্ট নাম। তিনি ছিলেন একাধারে

একজন আইনজ্ঞ ও আইনশিক্ষক। এ ছাড়াও তিনি ছিলেন একজন জনপ্রতিনিধি— বোম্বাই সরকারের আইনসভার সদস্য। বস্তুত, প্লেগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় তিলক সেনা নিয়োগের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন এবং বেশ কিছু কার্যকরী প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। কিন্তু সে সকলই অগ্রাহ্য করা করা হয়। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও তিনি ইংরেজদের কাছে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত একজন মানুষ ছিলেন। আমাদের জানা আছে যে, রানি ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের হীরক-জয়ন্তী উৎসবের নৈশভোজে তিনি একজন আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এত খাতিরযত্ন করেও ইংরেজরা তাঁকে বশ মানাতে পারেনি। তিনি মারাঠি ও ইংরেজি ভাষায় দুটি পত্রিকা চালাতেন। কেশরী পত্রিকায় তাঁর দৃপ্ত রচনা পুনা শহরের সাধারণ মানুষকে রাজনৈতিকভাবে তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তুলত। আর ইংরেজি কাগজটির মাধ্যমে তিলকের সরকারি কাজের সমালোচনা যেন সেকালের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান প্রেসের গায়ে আগুনের সেঁকা দিত। টাইমস অব ইন্ডিয়া, ডেলি মেল প্রভৃতি পত্রিকা তিলককে ইংরেজ শাসনের পরম শত্রু বলে মনে করত। আর, চার্লস র‍্যান্ড যখন ব্রিটিশ সৈন্যদের প্লেগ-দমনের কাজে লাগিয়ে দেন এবং তারা দেবস্থান অপবিত্র করে, নারীদের লাঞ্ছনা করে, তিলকের কাগজ তখন কঠোর ভাষায় ইংরেজ অপশাসনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠত। লেখক জ্ঞানপ্রকাশ নামে একটি খবরের কাগজ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছেন যে, 'নারী, শিশু ও অন্যান্যদের সামনে-পেছনে গার্ড দিয়ে, খালি পায়ে, খালি মাথায় দল বেঁধে নিয়ে যাওয়া হত ক্যাম্পের দিকে যেন তারা আইন ভঙ্গকারী একদল দস্যু বিশেষ' (পৃ. ৩১)। কংগ্রেস নেতা গোখলের প্রতিবাদ ও পরবর্তীকালে অবস্থা-দুর্বিপাকে সেই প্রতিবাদ তুলে নেওয়ায় (পৃ. ৩৩) তিলক কর্তৃক গোখলের সমালোচনা অনেকটা যেন সেম-সাইড হয়ে যায়। যাই হোক, তিলকের শিবাজি উৎসবের ভাষণগুলি মানুষের মর্মস্থলে পৌঁছে যেত। এই ভাবেই তিলকের ১৩ জুন ১৮৯৭-এর ভাষণ পৌঁছে যায় চাপেকর ভাইদের কাছে (পৃ. ৪৬)। এবার আমরা পাচ্ছি দামোদর চাপেকর নামে এক বিপ্লবী ও তাঁর দুই বিপ্লবী ভাই বালকৃষ্ণ ও বাসদেব-এর কথা। তাঁরা লোকমান্য তিলকের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সরকারি অব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিলকের কঠোর প্রতিবাদ তাঁদের উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। তাঁরা স্থির করলেন পুনাকে অত্যাচারী র‍্যান্ডের অপশাসন থেকে মুক্ত করতে হবে। ২২ জুন ১৮৯৭ কীভাবে তাঁরা সেই কাজটি করলেন নির্মলবাবু বইটির ৩৬ পৃষ্ঠায় তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন।

চাপেকর ভাইরা তখনও ধরা পড়েননি কিন্তু তিলকের বিরুদ্ধে ১২৪-এ ধারায় রাজদ্রোহের মামলা আনা হল। বিচারে তিলককে দেড় বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হল। কিন্তু এক বছর কারাবাসের পর ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮ তিনি মুক্তি পান (পৃ. ৫১)। ৩২ নম্বর নির্ঘণ্টে দেখছি যে লেখক তিলকের বিচারটি বিভিন্ন তথ্য থেকে দেখে নিয়েছেন। এই সূত্রে তাঁকে একবার Indian Political Trials (1775-1947) by A.G. Noorani বইটির তিলকের বিচার অংশটিও একবার দেখে নিতে অনুরোধ জানাই। তিলকের বিরুদ্ধে ১৮৯৭ ও ১৯০৮ এই দুটি মামলার বিষয়েই কিছু অজানা তথ্য পেতে পারেন। লেখক কিন্তু এই ছোট বইটিতেই তিলকের বিরুদ্ধে ১৯০৮ সালের মজঃফরপুর বোমার মামলা বিষয়েও বহু তথ্য উদ্ধার করেছেন (পৃ. ৬৬)।

পুনা শহরের মুক্তিদাতা দামোদর চাপেকর ধরা পড়লেন সরকার ঘোষিত পুরস্কারের লোভে। গণেশশঙ্কর ও রামচন্দ্র নামে দুইজন দ্রাবিড়ভ্রাতা দামোদরেব গ্রেপ্তারের জন্য দায়ী। গ্রেপ্তারের পর

দামোদরকে প্রলোভন দেখিয়ে দোষ স্বীকার না করা পর্যন্ত তাঁকে কোর্টে তোলা হল না। এবং শেষপর্যন্ত বিচারের প্রহসনে তাঁকে হত্যা করা হল। এই হত্যাকাণ্ডের এক মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন লেখক (বইটির পৃ. ৫৪-৫৭)। তিনি জানিয়েছেন যে দামোদর মৃত্যুবরণ করলেন 'গীতা হাতে হাসিমুখে ওঁ গঙ্গা নারায়ণ' ধ্বনি তুলে (পৃ. ৫৭)।

মেজো ভাই বালকৃষ্ণ কবে ধরা পড়েছিলেন সেই তথ্যটি নজরে পড়েনি। যাইহোক, বইটির পৃ. ৫৭-তেই দেখছি যে বালকৃষ্ণের মামলা শুরু হচ্ছে। বিচারে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলে তিনি বলেন Very Well (পৃ. ৬২), এ যেন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুঞ্জয় কবিতার একটি বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি— 'এই মাত্র? আর কিছু নয়?'

দুই অগ্রজের মামলার গতি-প্রকৃতি দেখতে দেখতে ছোটো ভাই বাসুদেব জেনে গেলেন যে গণেশশঙ্কর ও রামচন্দ্র দাদা দামোদরের হত্যার জন্য দায়ী। বাসুদেব প্রতিশোধ নিলেন তাঁর পিস্তলের গুলিতে তাদের মারাত্মক রকমে আহত করে। তারা দুজনেই পরে মারা যায়। বাসুদেব ধরা পড়েন। বিচারে তাঁরও ফাঁসির আদেশ হল। দাদা বালকৃষ্ণের ফাঁসি হবে ১২ মে ১৮৯৯ আর ভাই বাসুদেব ফাঁসিতে ঝুলতে চললেন ৮ মে। লেখক কে.সি. ঘোষের বই থেকে উদ্ধার করছেন— বাসুদেব তাঁর ফাঁসির দিন (৮ মে) দাদার সেলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে প্রফুল্ল কণ্ঠে বলেন, 'দাদা বিদায়, আমি চললাম'। দাদার সপ্রতিভ উত্তর— 'এসো, কদিন পরেই আমি আসছি' (পৃ. ৬২)।

বইটি উদ্ধৃতি নির্ভর হলেও সুখপাঠ্য। এরকম একটি গ্রন্থের জন্য লেখক ধন্যবাদার্হ। বইটির পরবর্তী সংস্করণের আশায় দু-একটি প্রস্তাব বিবেচনা করা যেতে পারে। মনে হয় আর একটু সম্পাদনা করে নিলে ভালো হয়। যেমন, ফড়কে যে 'গুপ্ত-সংকল্পের নেতৃত্ব' দিতেন তার মূল লক্ষ্য ছিল 'পুনরায় পেশোয়া-রাজকে' উজ্জীবিত করা (পৃ. ২১)। অথচ পৃ. ২২-এ বলা হল 'ফড়কের মাথায় ছিল ভারতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা'। ১৯২৮ এর নেহেরু প্রস্তাবের আগে প্রজাতন্ত্রের কল্পনা একটু যেন কষ্টকর। নির্ঘণ্টেও কিছু সম্পাদনার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। যেমন, একই তথ্যসূত্রকে অনাবশ্যকভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেখানোতে সূত্র সংখ্যা অনেক বেশি দেখাচ্ছে। উদাহরণ, সূত্র ১৩ এবং সূত্র ২২ (গ) খণ্ড-বিখণ্ড করে দুটি পৃথক সূত্র করা হয়েছে। অথচ দুটিই হল 'অনুসন্ধান ৩১ আষাঢ় ১৩০৪', পৃ. ৭৩। পরিশেষে বলি দীর্ঘ মুখ-পাত অংশে পৃষ্ঠা সংখ্যার উল্লেখ না থাকার অসুবিধা প্রকাশক এড়াতে পারতেন।

নির্মলকুমার নাগ : ফড়কে তিলক ও চাপেকর ভাইয়েরা। বাংলার মুখ। কলকাতা। ১৪২৫ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। বিনিময়- ১২৫ টাকা।

প্রকাশিত হয়েছে

অশোক চট্টোপাধ্যায়-এর নতুন প্রবন্ধগ্রন্থ

সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি ও বিপন্ন সময়

বিনিময় : ১৬০ টাকা

ছোঁয়া প্রকাশন

১৮এ, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১২

Space donated by :

A Well Wisher

প্রেস ও রেজিস্ট্রেশন আইনের ৫ নং ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

পত্রিকার নাম	:	সাংস্কৃতিক সমসময়
প্রকাশকাল	:	ত্রৈমাসিক
প্রকাশের স্থান	:	সাঁইপালা (ইউনাইটেড ক্লাবের পেছনে) বসিরহাট — ৭৪৩ ৪১১, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রক ও স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা	:	অশোক চট্টোপাধ্যায় সাঁইপালা (ইউনাইটেড ক্লাবের পেছনে) বসিরহাট — ৭৪৩ ৪১১, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

আমি, অশোক চট্টোপাধ্যায়, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত বিবৃতি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

তারিখ : এপ্রিল ১, ২০১৯

স্বাঃ অশোক চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক